

মন্তব্যগুরূ

সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

সপ্তবর্ণ

সপ্তম শ্রেণি

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক
অধ্যাপক নিরঙ্গন অধিকারী
অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক
অধ্যাপক শ্যামলী আকবর
অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর
ড. সরকার আবদুল মাল্লান
ড. শোয়াইব জিবরান
শামীম জাহান আহসান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ	: সেপ্টেম্বর, ২০১১
১ম পরিমার্জিত সংস্করণ	: সেপ্টেম্বর, ২০১৪
২য় পরিমার্জিত সংস্করণ	: সেপ্টেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ	: , ২০১৭

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলা ও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক শ্রেণির সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা সংগৃহী শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটির অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবন ও জগতের বিচিত্র বিষয়ে কৌতুহলী হবে, পাঠ্যভ্যাসে আগ্রহ দেখাবে, পঠিত বিষয়ের মর্ম অনুধাবন এবং চিন্তন দক্ষতা ও রসসংগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গদ্য		
১. কাবুলিওয়ালা	– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
২. লখার একুশে	– আবুবকর সিদ্দিক	৯
৩. মরু-ভাস্কর	– হৰীবুল্লাহ বাহার	১৪
৪. শব্দ থেকে কবিতা	– হুমায়ুন আজাদ	১৯
৫. পাখি	– লীলা মজুমদার	২৪
৬. পিতৃপুরুষের গল্প	– হারুন হাবীব	৩২
৭. ছবির রং	– হাশেম খান	৩৯
৮. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	– সেলিনা হোসেন	৪৪
৯. সেই ছেলেটি	– মামুনুর রশীদ	৪৯
১০. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসভা	– এ. কে. শেরাম	৫৫

কবিতা		
১. নতুন দেশ	– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬২
২. কুলি-মজুর	– কাজী নজরুল ইসলাম	৬৭
৩. আমার বাড়ি	– জসীম উদ্দীন	৭১
৪. শোন একটি মুজিবরের থেকে	– গোরাপ্রসন্ন মজুমদার	৭৬
৫. সবার আমি ছাত্র	– সুনির্মল বসু	৮০
৬. শ্রাবণে	– সুকুমার রায়	৮৫
৭. গরবিনী মা-জননী	– সিকান্দার আবু জাফর	৮৯
৮. সাম্য	– সুফিয়া কামাল	৯৪
৯. মেলা	– আহসান হাবীব	৯৭
১০. এই অক্ষরে	– মহাদেব সাহা	১০১

କାବୁଲିଓୟାଲା

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର



ଆମାର ପାଂଚ ବଚର ବସେର ଛୋଟ ମେଯେ ମିନି ଏକ ଦଣ୍ଡ କଥା ନା କହିଯା ଥାକିତେ ପାରେ ନା ।

সକାଳବେଳାଯ ଆମାର ନଭେଲେର ସଞ୍ଚଦଶ ପରିଚେଦେ ହାତ ଦିଯାଛି ଏମନ ସମୟ ମିନି ଆସିଯାଇ ଆରଙ୍ଗ କରିଯା ଦିଲ, “ବାବା, ରାମଦୟାଲ ଦରୋଯାନ କାକକେ କୌଯା ବଲଛିଲ, ସେ କିଛୁ ଜାନେ ନା । ନା ?”

ସେ ଆମାର ଲିଖିବାର ଟେବିଲେର ପାର୍ଶ୍ଵ ଆମାର ପାଯେର କାଛେ ବସିଯା ନିଜେର ଦୁଇ ହାତୁ ଏବଂ ହାତ ଲାହିଯା ଅତିରିକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣେ ଆଗଡୁମ-ବାଗଡୁମ ଖେଳିତେ ଆରଙ୍ଗ କରିଯା ଦିଲ ।

ଆମାର ସର ପଥେର ଧାରେ । ହଠାତ୍ ମିନି ଆଗଡୁମ-ବାଗଡୁମ ଖେଳା ରାଖିଯା ଜାନାଲାର ଧାରେ ଛୁଟିଯା ଗେଲ ଏବଂ ଚିଢ଼କାର କରିଯା ଡାକିତେ ଲାଗିଲ, “କାବୁଲିଓୟାଲା, ଓ କାବୁଲିଓୟାଲା ।”

ଫର୍ମା-୧, ୭ମ ଶ୍ରେଣୀ (ସଞ୍ଚଦଶ)

ময়লা তিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা পথ দিয়া যাইতেছিল — তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিন্ধুর ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে উর্ধ্বশাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল।

মিনির চিংকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে উর্ধ্বশাসে অস্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অঙ্গ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতর সঞ্চাল করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙ্গাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অস্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম — সে আমার গা ঘেঁষিয়া দাঢ়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিসমিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাসযুক্তে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবৰ্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিসমিসে পরিপূর্ণ।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাত তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেন্তাবাদাম ঘুম দিয়া মিনির ক্ষুদ্র হন্দয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বস্তুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে — যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজাসা করিত, “কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী।” রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, “হাঁতি।”

উহাদের মধ্যে আরও-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, “খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখনুন যাবে না!”

কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ — সে উল্টিয়া জিজাসা করিত, “তুমি শুনুরবাড়ি যাবে ?”

রহমত কাল্পনিক শুণুরের প্রতি প্রকাণ মোটা মুষ্টি আঞ্চলন করিয়া বলিত, “হামি সসুরকে মারবে।”

শুনিয়া মিনি শুণুর-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

মিনির মা অত্যন্ত শক্তি স্বভাবের লোক। রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না।

তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন।

একদিন সকালে আমার ছেট ঘরে বসিয়া প্রফশিট সংশোধন করিতেছি। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে — তাহার পশ্চাতে কৌতুহলী ছেলের দল চলিয়াছে। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত — মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় ‘কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা’ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি শুশ্রবাঢ়ির যাবে?”

রহমত হাসিয়া কহিল, “সিখানেই যাচ্ছে।”

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লশ্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, “কী রে রহমত, কবে আসিলি।”

সে কহিল, “কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।”

আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, “আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।”

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাত চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, “খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না ?”

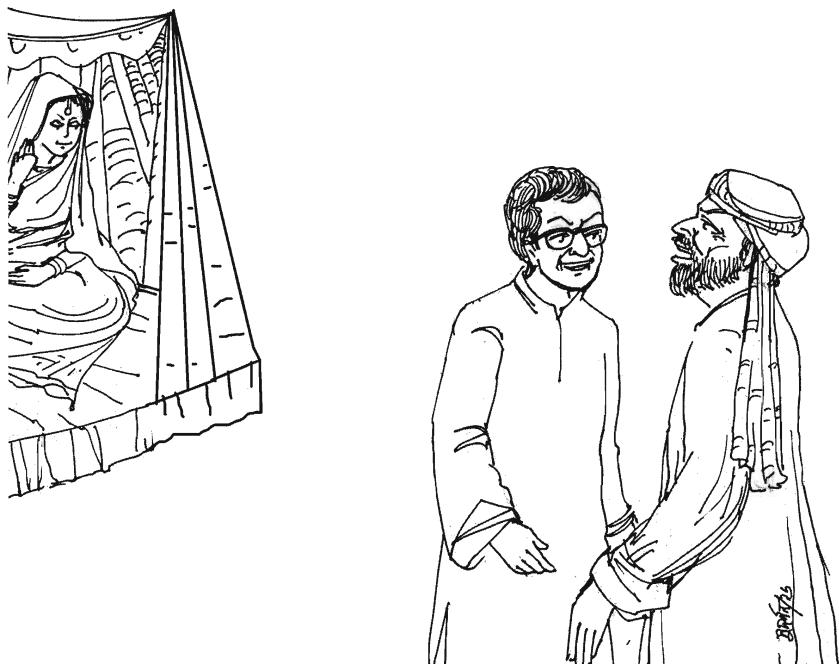
আমি কহিলাম, “আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।”

সে যেন কিছু ক্ষুঁশ হইল। স্তন্ধনাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থিরস্থিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে ‘বাবু সেলাম’ বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি ৯০ সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, “এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিসমিস বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।”

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাতে আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, “আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে — আমাকে পয়সা দিবেন না। বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কি আছে, তেমনি



দেশে আমারও একটি লড়কি আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।”

এই বলিয়া সে আপনার মন্ত টিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বল স্বত্ত্বে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছেট হাতের ছাপ। ফটোঘাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভূষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নকুক বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে।

দেখিয়া আমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাত তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধুবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, “খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস?”

কাবুলিওয়ালার সত্তি মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটি ইতিমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, “রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।”

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

কাবুল	— আফগানিস্তানের রাজধানী।
কাবুলিওয়ালা	— কাবুলের অধিবাসী। অতীতে কাবুলের অনেক লোক নানা কাজ নিয়ে এ দেশে নিয়মিত যাতায়াত করত।
দণ্ড	— মুহূর্ত।
নঙ্গেল	— উপন্যাস।
সপ্তদশ	— সতেরো।
পরিচ্ছেদ	— অধ্যায়।
পার্শ্বে	— পাশে
কন্যারত্ন	— কন্যাকে আদর করে রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
ভাবোদয়	— ভাবের উদয়। মনে চিন্তা বা ভাবনা জাগা।
উর্ধ্বশ্বাসে	— অতি দ্রুতবেগে।
অন্তঃপুর	— বাড়ির ভেতরের অংশ।
অভিপ্রায়	— ইচ্ছা।
খোবানি	— বাদাম জাতীয় ফল।
দুহিতা	— কন্যা।
ঘার	— দরজা।
সমীপস্থ	— নিকটে, কাছে।
অনর্গল	— অবিরাম, অনবরত।
সহাস্যমুখ	— হাসি মুখ।
পঞ্চবৰ্ষীয়	— পাঁচ বছর বয়সী।

খোঁখী	— কাবুলিওয়ালা কর্তৃক ‘খুকি’ শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ।
স্বত্বাবিরুদ্ধ	— স্বত্বাবের বিপরীত।
মুষ্টি আঙ্কালন	— জোরে মুষ্টি নাড়ানো।
নিঃসংশয়	— শক্তাহীন।
কিঞ্চিৎ	— অল্প।
ধারিত	— ঝটপ্রস্ত।
প্রফুল্ল	— আনন্দিত।
লড়কি	— মেয়ে।

পাঠের উদ্দেশ্য

বাংলা ভাষার সাধু রীতির সাহিত্য পাঠে অনুপ্রাণিত করা।

পাঠ-পরিচিতি

ভিল সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠলেও মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ ভালোবাসার অনুভূতি অনেকাংশেই এক। ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফগানিস্তানের মুক্ত পর্বতের রক্ষ প্রকৃতিতে গড়ে ওঠা একজন পিতা এবং নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার একজন বাঙালি পিতার ভেতরের স্নেহপ্রবণ মনের ঐক্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। দেশকালের সীমারেখা পিতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতায় কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। যে দেশের বা যে সময়ের বা যে সংস্কৃতিরই মানুষ হোক না কেন পিতা সব সময়ই তার সন্তানকে একই রকমভাবে ভালোবাসেন। সন্তানের মঙ্গল-চিন্তা সব পিতারই সহজাত আকাঙ্ক্ষা। ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের সকল পিতার পিতৃত্বের সার্বজনীন ও চিরস্মৃত রূপকে উন্মোচিত করেছেন।

লেখক-পরিচিতি

এশীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ঘর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পারিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয় নি। সতেরো বছর বয়সে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। সে-পড়া শেষ না হতেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু স্বশিক্ষা ও সাধনার একক অবদানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছেন যার কোনো তুলনা নেই। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত- সাহিত্যের সকল শাখা তাঁর আকর্ষ্য অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ এবং চিত্রকলাতেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

অনন্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক এবং অভিনেতা। শাস্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি দেশপ্রেমমূলক গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। রবীন্দ্রনাথের লেখা ১৯৮০

গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে ‘কৈশোরক’ নামে একটি সংকলনে।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. সাধু রীতিতে লেখা ১০টি গল্পের তালিকা তৈরি কর। (একক কাজ)
- খ. পাঠ্য বইয়ের ১টি করে সাধু ও চলিতরীতির গদ্য অবলম্বনে রীতি দুটোর ৫টি পার্থক্য বের কর। (দলীয় কাজ)
- গ. সাধু রীতির একটি অনুচ্ছেদ চলিত রীতিতে রূপান্তর কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পে শক্তি স্বভাবের মানুষটি কে ?
 - ক. রহমত
 - খ. মিনির মা
 - গ. রামদয়াল
 - ঘ. মিনির বাবা
২. মিনির বাবার মনে একটু ব্যথা বোধ হয়েছিল কেন ?
 - ক. মিনির শুশুর বাড়ি যাচ্ছে বলে
 - খ. রহমতকে কারাগারে যেতে দেখে
 - গ. মিনির সাথে রহমতের দেখা না হওয়ায়
 - ঘ. রহমতের মেয়ের কথা ভেবে

উদ্বোধকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফাতেমা চৌধুরী অফিসে যাওয়ার পথে প্রায়ই একটি পথশিশুকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখেন। একদিন তিনি ছেলেটিকে কিছু খাবার দিতে চাইলে সে ভয়ে পালিয়ে যায়। কয়েকদিনের চেষ্টায় ছেলেটি তার সাথে নানা গল্প মেতে উঠে। এখন প্রায়দিনই তিনি ছেলেটির জন্য বাসায় তৈরি খাবার নিয়ে আসেন। তবে কখনো তার দেখা না পেলে খুব চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

৩. উদ্বোধকের ফাতেমা চৌধুরীর সাথে ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে ?
 - ক. রহমত
 - খ. রামদয়াল
 - গ. লেখক
 - ঘ. মিনি

৮. উদ্দীপকে ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পের কোন দিকটি ফুটে ওঠেছে ?

- i. সন্তান বাস্তল্য
- ii. সহমর্মিতা
- iii. সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১ : নতুন দারোয়ান সামাদ মিয়ার সাথে ছেলের বেশি ভাব-বস্তু কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না আবীরের মা। তিনি স্বামীকে বোঝান — বিভিন্ন ফন্দি করে অনেক মানুষ এখন অন্যের বাচ্চা চুরি করে। সামাদ মিয়াও তো একদিন তেমন কিছু করে বসতে পারে।

উদ্দীপক-২ : বারো বছর আগের ছোট আবীর আজ কলেজ থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় হাসপাতালে। রক্তের জন্য বাবা-মা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করছেন। খবর পেয়ে সামাদ মিয়া ছুটে এসে হাটুয়াট করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন — ‘সাহেব, আবীর বাবার জন্য আমার সব রক্ত নেন, আমার নিজের ছেলেরে হারাইছি, ওরে হারাইলে আমি বাঁচুম না।’

- ক. কাবুলিওয়ালার মলিন কাগজটিতে কী ছিল?
- খ. রহমতকে কারাবরণ করতে হয়েছিল কেন?
- গ. উদ্দীপক-১ অংশে ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে — ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘উদ্দীপকের সামাদ মিয়া যেন কাবুলিওয়ালা গল্পের মূল ভাবকেই ধারণ করে আছে’ — বিশ্঳েষণ কর।

লখার একুশে আবুবকর সিদ্ধিক



লখার রাতের বিছানা ফুটপাতের কঠিন শান। এই শান দিনের বেলায় রোদে পুড়ে গরম হয়। রাতে হিম
লেগে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা শানে শয়ে লখার বুকে কাশি বসে। গায়ে জ্বর ওঠে।

বাপকে লখা দেখে নি। চেনে না। যা তার ত্যানাখানি পরে দিনভর কেঁদে-কেঁদে ভিখ মেঝে ফেরে। লখার
দিন কাটে গুলি খেলে, ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে, বঙ্গদের সঙ্গে মারামারি করে আর খাবারের দোকানের
এঁটোপাতা চেঁটে। রাতে মাঝের পাশে সখা খিদের কষ্ট ভুলে যায়।

এই লখা, ছায়া দেখলে বুক কাঁপে যাব, সে আজ তোরাতে মাঝের পাশ থেকে উঠে পড়ল। যা মুখ হাঁ করে
মুমুচ্ছে। লখা চুপি চুপি পা ফেলে হারিয়ে গেল ধোয়া-ধোয়া কুয়াশার মধ্যে।

খানিকটা এগিয়ে উঁচু রেললাইন ঘেন দুটো মরা সাপ। পাশাপাশি শুরো আছে চুপচাপ। লখা ইটের টুকরো
দিয়ে ইস্পাতের লাইন টুক-টুক টুকে তার উপর কান পাতল। হাঁ, শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘেন গানের সুরলহরি
বয়ে যাচ্ছে কানের ভিতর দিয়ে। লখা ভারি মজার দুষ্ট হেলে। গানের মজা ফুরিয়ে গেলে পর এক লাফে
লাইন পেরিয়ে ওপারে পৌছে পেল। সেখানে মন্ত নিচু খাদ। তার ভিতর গঢ়িয়ে পড়লে হাত-পা ভাঙবে
নির্ধারিত। খুব সাবধানে খাদ পেরিয়ে ওপারের ডাঙায় উঠে এলো সে। ডাঙাটা আসলে বনজঙ্গলে অঙ্ককার।
ঝির্কি পোকা ডাকছে আর খেড়ে খেড়ে গাছের ঝাঁকড়া ছায়া মাথা নেড়ে নেড়ে ভয় দেখাচ্ছে লখাকে।

খচ করে কাঁটা দুকে গেল বাঁ পায়ে। কীসের কাঁটা? হবে হয়তো বাবলা-টাবলার। লখা উবু হয়ে বসে কাঁটাটা
খসিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলো। কিন্তু বিষ তো যায় না। কী অসহ্য যন্ত্রণা। আঁ আঁ বলে কেঁদে দিলো লখা।
কিন্তু কাঁদলে তো চলবে না। সময় নেই আর। তাকে যে যেতেই হবে। আবছা অঙ্ককার। ফিনফিনে ঠাণ্ডা।

গাছের পাতা বেয়ে শিশির গড়িয়ে পড়ছে। খুক খুক করে কাশি আসছে লখার। খালি গা শিশিরে ভিজে শীত লাগছে। একটা হ্যাঁচড়া ডাল লখার হাফপ্যান্টটা টেনে ধরেছে পিছন দিক দিয়ে। প্যান্ট আধখসা অবস্থায় দৌড়াতে লাগল সে।

একটা খেকশেয়াল বুঝি তাকিয়ে দেখছিল তাকে। দেখুক গে। এখন ভয় করলে দেরি হয়ে যাবে। কাজেই এবার চোখ-কান বুজে দৌড় শুরু করতে হলো তাকে। আর শেষটায় সেই অঙ্গুত গাছটার নিচে পৌছে গেল লখা, যার ডালে ডালে রঞ্জের মতো টুকটুকে লাল ফুল। দিনের বেলায় রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে থোকা থোকা ফুলের লাল ঝুঁটির পানে তাকিয়ে থাকে সে। এখন ওই উপরের এক থোকা ফুল তার পেড়ে আনা চাই।

হাতের মুঠো পাকিয়ে মনটাকে শক্ত করে নিল লখা। তারপর চড় চড় করে গাছে উঠে গেল। একেবারে কাঠবেড়ালির বাচ্চা যেন। মগডালের কাছাকাছি এসে কয়েকটা তুলোমিঠের মতো বড় বড় থোকা পেয়ে গেল সে। শিশিরে ভেজা তুলতুলে। তা হোক, তোমরা এখন আমার। নাও সব টুপটাপ নেমে এসো তো আমার মুঠোর মধ্যে। কষ্ট লাগছে। আহা! কীসের কষ্ট? এই তো একটু পরে আমি তোমাদের এমন একটা উঁচু জায়গায় নিয়ে রেখে দেবো, যেখান অবধি তোমরা এই গাছের মগডালে কোনোদিন উঠতে পারবে না। এসো, এসো, লক্ষ্মীসোনারা সব নেমে এসো তো।

ফুল নিয়ে যখন মাটিতে নেমে এলো লখা, তখন সারা শরীর জলে যাচ্ছে তার। কনুই ও বুকে চটচটে ঠাণ্ডা। হাত দিয়ে টের পায়, টাটকা রক্ষ। গাছের ডালপালা কাঁটায় ভর্তি। গা-হাত-পা ছিঁড়ে গেছে আঁচড় লেগে। তাতে কী! জিতে গেছি আমি। গর্বে বুক ফুলে উঠে লখার।

সেদিন সকাল ছিল বড় আশ্চর্য সুন্দর। আকাশে হালকা কুয়াশা। অল্প অল্প শীত। আর দক্ষিণের সামান্য বাতাস। পথে পথে মিছিলের ঢল নেমেছে। শত শত মানুষ। হাতে ফুলের শুচ্ছ। ঠোঁটে প্রভাতফেরির গান। ধীর পায়ে শহিদ মিনারের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই ভিড়ের মধ্যে ক্ষুদে টোকাই লখাকে ঠিকই দেখা যাচ্ছে। তাকে চিনতে কষ্ট হয় না। কারণ মিছিলের সবার গায়ে চাঁদর, কোট, সোয়েটার। শুধু তার গা খোলা উদাম, গাঢ় কালো। হাত উপচে পড়ছে রক্তলাল ফুলের শুচ্ছ। মিছিলে পা মিলিয়ে সেও চলেছে শহিদ মিনারে ফুল দিতে। সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে চলছে — আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেরুংয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি? কিন্তু তার গলা দিয়ে কথা তো ফোটে না, শুধু শব্দ হয় আঁ আঁ আঁ আঁ।

আসলে কথা ফুটবে কী করে? লখা যে জন্মবোবা। বাংলা বুলি তার মুখে ফুটতে পায় না। সে মনে মনে বলে — অ আ ক খ। বাইরে শব্দ হয় — আঁ আঁ আঁ আঁ।

শব্দার্থ ও টীকা

শান	-	পাথর। এখানে কংক্রিটে তৈরি ফুটপাথ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।
ত্যানাখানি	-	পুরনো ছেঁড়া কাপড়।
ভিখ	-	ভিক্ষা, খয়রাত।
মেঝে	-	চেয়ে।
গুলি খেলা	-	মার্বেল দিয়ে খেলা।

- ছায়া দেখলে বুক কাঁপে যাব - যে নিজের ছায়াকেও ভয় পায়। খুব ভীতু।
- বিষ - যে পদাৰ্থ শৱীৱে চুকলে যে কোনো প্ৰাণী অসুস্থ হয়, কখনো কখনো মাৰাও যায়। এখানে পথে কাঁটা ফোটাৰ জন্য ‘ব্যথা’ অৰ্থে ব্যবহাৰ কৰা হয়েছে।
- তুলোমিঠে - তুলোৱ মতো দেখতে মিষ্টি খাদ্য বিশেষ। একে ‘হাওয়াই মিঠাই’-ও বলে।
- মগডাল - গাছেৰ সবচেয়ে উঁচু ডাল।
- গাঢ় - ঘন।
- প্ৰভাত ফেরি - ভোৱবেলা দল বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় গান গেয়ে সবাইকে জাগিয়ে তোলাৰ অনুষ্ঠান বিশেষ। কিন্তু বাংলাদেশে প্ৰভাতফেরি একটি বিশেষ অৰ্থ বহন কৰে। এটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্ৰভাষা হিসেবে ব্যবহাৰ কৰাৰ দাবিতে আন্দোলন হয়। তখন ছিল পাকিস্তান। তখনকাৰ সৱকাৰ সে-দাবি মানে না। তখন ছাত্ৰ-জনতা তীব্ৰ আন্দোলন কৰতে থাকে। সেই আন্দোলন চৰমে উঠে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালেৰ ২১শে ফেব্ৰুয়াৱি ঢাকায় ছাত্ৰ-জনতাৰ মিছিলে তৎকালীন সৱকাৰেৰ পুলিশ শুলি চালায়। তাতে শহিদ হন রফিক, সালাম, বৱৰকত, জবৰাসহ আৱও অনেকে। তাৰই স্মৰণে প্ৰতিবছৰ ২১শে ফেব্ৰুয়াৱি প্ৰভাতফেরি কৰা হয়। প্ৰভাতফেরিৰ সময় সকলেৰ কষ্টে থাকে আবদুল গাফুফাৰ চৌধুৱী রচিত এবং শহিদ আলতাফ মাহমুদেৰ সুৱ কৰা গান ‘আমাৰ ভাইয়েৰ রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্ৰুয়াৱি, আমি কি ভুলিতে পাৰি’।
- শহিদ মিনার - শহিদেৱ স্মৃতি রক্ষাৰ জন্য নিৰ্মিত মিনার। ভাষা-আন্দোলনেৰ শহিদেৱ স্মৰণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেৰ সন্ধিকটে আমাদেৱ কেন্দ্ৰীয় শহিদ মিনার অবস্থিত।

পাঠেৱ উদ্দেশ্য

ভাষা-আন্দোলনেৰ চেতনায় শিক্ষার্থীদেৱ উদ্বৃক্ত কৰা।

পাঠ-পৱিচিতি

গল্পটিতে একুশে ফেব্ৰুয়াৱিৰ অবিনাশী প্ৰভাৱেৰ কথা বলা হয়েছে। অতি সাধাৱণ এক কিশোৱ লখা। কথা বলতে পাৱে না সে। কিন্তু তাতে কীই-বা আসে যায়। লখা উঁচু ডালে উঠে লাল ফুল সংগ্ৰহ কৰে শহিদ মিনারে যায় শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰতে। কথা বলতে না পাৱলেও তাৰ মুখ দিয়ে আঁ আঁ আঁ ধৰনিৰ মধ্য দিয়েই বেৱিয়ে আসে বাঞ্ছালিৰ গৰ্বেৱ উচ্চারণ — ‘আমাৰ ভাইয়েৰ রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্ৰুয়াৱি’।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুবকর সিদ্দিক ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য প্রস্তুতি হলো : ‘জলরাঙ্কস’, ‘খরাদাহ’, ‘একান্তরের হৃদয়ভূমি’, ‘বারুদ পোড়া প্রহর’ ইত্যাদি।

কর্ম-অনুষ্ঠীলন

- ক. শহিদ দিবসের ওপর শিক্ষার্থীরা আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।
- খ. শহিদ দিবস উপলক্ষে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদির সমষ্টিয়ে দেয়ালিকা প্রকাশ করবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লখা কখন তার খিদের কষ্ট ভুলে যায় —
 - ক. ঘুমুতে গেলে
 - খ. মাকে কাছে পেলে
 - গ. খেলার সঙ্গী পেলে
 - ঘ. অভাবফেরির গান শুনলে
২. লখাকে চোখ-কান বুজে দৌড় শুরু করতে হলো, কারণ —
 - ক. সে ভয় পেয়েছিল
 - খ. বাইরে অঙ্ককার ছিল
 - গ. তাকে ফুল আনতে হবে
 - ঘ. যায়ের কাছে ফিরে যেতে হবে
৩. উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাবার সাথে অভাবফেরিতে এসেছে দিপু। ওর হাতে একটা টকটকে লাল গোপাল। ওর কষ্টে গানের সুর ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’। ও লাল গোলাপটিকে শহিদ মিনারের সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে রাখতে চায়।
৪. লখা ও দিপুর মধ্যে যে বিষয়ে মিল আছে তা হলো —
 - ক. শহিদ মিনারে আসা মানুষ দেখার ইচ্ছা
 - খ. শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর আবেগ
 - গ. প্রতিবন্ধকতা দূর করার অদম্য বাসনা
 - ঘ. শহিদ দিবসের গান গাওয়ার আবক্ষ
৫. দিপু ও লখা দুজনেই শহিদ দিবস উদযাপন করেছিল; তবুও লখাই প্রমাণ করেছে যে —
 - i. ভালোবাসার অনুভূতি প্রতিবন্ধকতার চেয়ে শক্তিশালী
 - ii. আত্মবিশ্বাস দ্বারা বাধাকে অতিক্রম করা যায়
 - iii. শিশুরা অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ

কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১. ইশতিয়াক এবার বৃত্তি নিয়ে জাপানে লেখাপড়া করতে চলে আসায় শহিদ দিবস উদযাপন করতে পারবে না। অথচ প্রতিবছর সে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করত — বক্তৃতা, আবৃত্তি, আলোচনা শুনত, সে-কথা মনে করে তার চেখ জলে ভরে আসে। মনে মনে কিছু করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে। অতঃপর ইশতিয়াক আন্তর্জাতিক মাত্তাষাদ দিবস ও তার ইতিহাস সহপাঠীদের কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনা করে।

ক. লখা রাতে কোথায় ঘুমায়?

খ. ‘জিতে গেছি আমি। গর্বে বুক ফুলে ওঠে লখার’। — কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. ‘লখা ও ইশতিয়াক দুজনের কাছে শহিদ দিবস ভিন্ন আঙ্গিকে এসেছে।’ — ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘ইশতিয়াকের শহিদ দিবস উদ্যাপনের আকাঙ্ক্ষা লখার শহিদ দিবস উদ্যাপনের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন।’ — বিশ্লেষণ কর।

মরু-ভাস্কর হৰীবুল্লাহ বাহার



যেসব মহাপুরুষের আবির্ভাবে পৃথিবী ধন্য হয়েছে – মানুষের জীবনে ঘাঁরা এনেছেন সৌষ্ঠব, ফুটিয়েছেন লাবণ্য, মরুভাস্কর হ্যরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন আলোচনা করতে গিয়ে সকলের আগে আমাদের চোখে পড়ে তাঁর ঐতিহাসিকতা। হ্যরতের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিবরণ যেভাবে রক্ষা করা হয়েছে, সত্যের কষ্টপাথের ঘষে যেভাবে যাচাই করা হয়েছে, পৃথিবীর কোনো মহাপুরুষের বেলায় তা করা হয়নি।

আরবের লোকের স্মৃতিশক্তি ছিল সত্যি অসাধারণ। বিরাট বিরাট কাবগ্রহ সহজেই তারা মুখস্থ করে ফেলত। আরবি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, মুখস্থ না করে কোনো কিছু লিখে রাখা আরবিরা লজ্জার কথা বলে মনে করত। সাহাবিরা এবং অন্যান্য হাদিসজ্ঞরা অনেকেই হাজার হাজার হাদিস মুখস্থ করে রাখতেন।

হ্যরত মোস্তফা (স.) মানবতার গৌরব। আল্লাহর নবি হওয়া সঙ্গেও তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষই মনে করতেন এবং সেভাবেই তিনি জীবনযাপন করেছেন। ৬৩ বছরের ক্ষুদ্র পরিসর জীবনে হ্যরতকে কত পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, দেখলে অবাক হতে হয়। যিনি ছিলেন এতিম, তিনি হয়েছিলেন সারা আরবভূমির অবিসংবাদিত নেতা। হ্যরত যখন মদিনার অধিনায়ক, তখন তাঁর ঘরের আসবাব ছিল – একখানা খেজুর পাতার বিছানা আর একটি পানির সুরাহি। অনেক দিন তাঁকে অনাহারে থাকতে হত এবং অনেক সময় উন্নুনে ড্রলত না আগুন।

হ্যরতের চরিত্রে সংমিশ্রণ হয়েছিল কোমল আর কঠোরের। বিশাসে যিনি ছিলেন অজেয়, অকুতোভয়, সত্যে ও সংগ্রামে যিনি বজ্জ্বের মতো কঠোর, পর্বতের মতো অটল, তাঁকেই আবার দেখতে পাই – কুসুমের চেয়েও কোমল। বঙ্গ-বান্ধবের জন্য তাঁর প্রীতির অন্ত নেই – মুখ তাঁর সব সময় হাসিহাসি, ছেলেপিলের সঙ্গে ঘেশেন তিনি একেবারে শিশুর মন নিয়ে – পথে দেখা হলে বালক-বঙ্গকে তার বুলবুলির খবর জিজেস করতে তাঁর ভুল হয় না। বঙ্গবিয়োগে চক্ষু তাঁর অশ্রুসিঙ্ক হয়। বহু দিন পর দাই-মা হালিমাকে দেখে ‘মা আমার, মা আমার’ বলে তিনি আকুল হয়ে উঠেন। মক্কাবিজয়ের পর সাফা পর্বতের পাদদেশে বসে হ্যরত বজ্জ্বতা করছিলেন। একজন লোক তাঁর সামনে এসে ভয়ে কাঁপতে লাগল। হ্যরত অভয় দিয়ে বললেন : ভয় করছ কেন? আমি রাজা নই, কারও মুনিবও নই – এমন মায়ের সন্তান আমি, শুক্র খাদ্যই যঁর আহার্য।

হ্যরত জীবনে কাউকে কড়া কথা বলেননি – কাউকে অভিসম্পাত দেননি। আনাস নামক এক ভৃত্য দশ বছর হ্যরতের চাকরি করার পর বলেছেন – এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে হ্যরতের মুখে তিনি কড়া কথা শোনেননি কখনো। মক্কায় বা তায়েফে অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও হ্যরতের মুখে অভিসম্পাতের বাণী উচ্চারিত হয়নি। বরং তিনি বলেছেন, এদের জ্ঞান দাও প্রভু – এদের ক্ষমা করো।

জগতে সাম্যের প্রতিষ্ঠা মোস্তফা চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও দাস-ব্যবসায়ের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মানবাত্মা যখন গুমরে মরছিল, রাসুলুল্লাহ (স.) তখন প্রচার করেন সাম্যের বাণী।

সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। চরম দুরবস্থার হাত থেকে দাসদের পরিত্রাগের জন্যও তিনি কাজ করেছেন। মানুষকে সালাতে আহ্বান করার জন্যে মুয়ায়খিন নিযুক্ত করেছেন হাবশি গোলাম হ্যরত বেলালকে।

নারীর অবস্থার পরিবর্তন এনেছেন হ্যরত। নারীর মর্যাদা ছিল তাঁর শিক্ষার অস্তর্ভুক্ত। তাঁর কন্যা হ্যরত ফাতেমা (রা.)-কে কেন্দ্র করে সে যুগে গড়ে উঠেছে নারীত্বের আদর্শ। হ্যরত ঘোষণা করেছেন: বেহেশত মায়ের পায়ের নিচে।

কুসংস্কারকে হ্যরত কোনো দিনই প্রশ্রয় দেননি। একবার হ্যরতের পুত্রের মৃত্যুদিনে সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। লোকে বলাবলি করতে থাকে – বুঝি হ্যরতের বিপদে প্রকৃতি শোকাবেশ পরিধান করেছে। তখনি সভা ডেকে হ্যরত এই বাস্তবতাবিরোধী কথার প্রতিবাদ করলেন; বললেন, “আল্লাহর বহু নির্দর্শনের মধ্যে দুটি – চন্দ্র ও সূর্য। কাবুর জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ্র – সূর্যে গ্রহণ লাগতে পারে না।”

হ্যরত জ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছেন সব সময়। জ্ঞান যেন হারানো উটের মতো – তাকে তিনি খঁজে বের করতে বলেছেন যেখান থেকেই হোক। আরও বলেছেন তিনি: জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহিদের লহুর চাইতেও পবিত্র।

এইভাবে জ্ঞানের আলোয় মানুষের হৃদয় উজ্জ্বল করার প্রেরণা দিয়ে গেছেন তিনি।

(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

শব্দার্থ ও টিকা

মরু-ভাস্কর-	মরুভূমির সূর্য। এখানে হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-কে বোঝানো হয়েছে।
সৌষ্ঠব-	সুগঠন।
কষ্টপাথর-	ঘষে সোনা পরীক্ষা করার এক রকম কালো পাথর।
সুরাই-	পানির এক রকম পাত্র, সোরাই, জলের কুঁজো।
অকুতোভয়-	যার কোনো কিছুতে ভয় নেই, নিতীক।
অভিসম্পাত-	অভিশাপ।
পরিত্রাণ-	মুক্তি।
হাবশি গোলাম-	আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) জননাহণকারী ক্রীতদাস।
লহু-	রক্ত।

পাঠের উদ্দেশ্য

মহামানবদের প্রতি শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।

পাঠ- পরিচিতি

‘মরু-ভাস্কর’ প্রবক্ষে লেখক মহানবির জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন যা আমাদের ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতার বিকাশে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সেই মহাপুরুষদের মধ্যে একজন যিনি চরিত্রবান; মানবপ্রেমে, জীবপ্রেমে মহীয়ান। বিপদে ধৈর্যশীলতা, দারিদ্র্যে অচঞ্চলতা, শক্তির প্রতি ক্ষমাশীলতার মহৎ দৃষ্টান্তে তাঁর জীবন সমূজ্জ্বল। অনেক মহাপুরুষের জীবন প্রকৃত তথ্যের চেয়ে কাল্পনিক নানা তথ্যে ভরা। কিন্তু হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনের যত তথ্য পাওয়া যায় সবই ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে স্বীকৃত।

আল্লাহর মহান নবি হওয়া সত্ত্বেও হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন সাধারণ মানুষের মতো। তাই তিনি মানবজাতির গৌরব।

তাঁর ৬৩ বছরের ঘটনাবহুল জীবনে, নানা পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর জীবনের মূলধারা ছিল অপরিবর্তিত। তিনি সব সময় সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। তাঁর চরিত্রে মিশে ছিল হাসিখুশি ভাব, কোমলতা ও কঠোরতা। আপন বিশ্বাসে, সত্যের জন্য সংগ্রামে তিনি ছিলেন বছরের মতো কঠোর, পর্বতের মতো অটল। কিন্তু নারী-পুরুষ, বন্ধুবান্ধব, শিশু কিশোর, আত্মীয়-স্বজন সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত আচরণে তিনি ছিলেন কুসুমের মতো কোমল। তাঁর চরিত্র ছিল প্রীতিতে, মমতায়, স্নেহে, সৌজন্যে দয়ার আধার। জীবনে কাউকে তিনি কড়া কথা বলেননি, কাউকে অভিসম্পাত দেননি। নিজে নির্যাতিত হয়েও প্রতিদানে তিনি ক্ষমা করেছেন।

হ্যরত মানুষে মানুষে তেদাভেদের পরিবর্তে সাম্যের বাণী প্রচার করে গেছেন। তিনি চরম দুরবস্থা-কবলিত ক্রীতদাসের পরিত্রাণের জন্য কাজ করে গেছেন। নারীর অবস্থার পরিবর্তন ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। অন্য ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সহিষ্ণু।

হ্যরত কুসংস্কারকে কখনো প্রশ্ন দেননি। যা সত্য, যা যুক্তিহ্য, তার পক্ষেই তিনি অবস্থান নিয়েছেন। হ্যরত জ্ঞানচর্চার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সব সময়। এর ফলে মুসলিম সমাজ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

হৰীবুংগাহু বাহার ছিলেন কবি নজরলের ‘ভক্ত শিষ্য’ এবং চিন্তা ও কর্মে পুরোপুরি মানবতাবাদী। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। মূলত প্রবন্ধকার হলেও তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন।

যেমন ‘ওমর ফারুক’, ‘আমীর আলী’ ইত্যাদি। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. মহামানবদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে তাঁদের অনুসরণে ৫টি কল্যাণকর কাজের তালিকা তৈরি কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হ্যরত মুহাম্মদ (স.) কোন ক্ষেত্রে বজ্জ্বের মতো কঠোর ছিলেন?

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ক. গভীর আত্মবিশ্বাসে | খ. নারীর মর্যাদা রক্ষায় |
| গ. সত্য ও সংগ্রামের চেতনায় | ঘ. সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় |

২. ‘এদের জ্ঞান দাও প্রভু – এদের ক্ষমা কর’ – উক্তিটির মধ্য দিয়ে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রাধান্য পেয়েছে?

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| ক. ক্ষমা ও মহানুভবতা | খ. দয়া ও করণা |
| গ. প্রেম ও ভালোবাসা | ঘ. বাংসল্য ও ন্যায়বিচার |

৩. ‘কারূর জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ-সূর্যে গ্রহণ লাগতে পারে না’ – উক্তিটির মধ্য দিয়ে হ্যরতের কোন ধরনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

- | | |
|-------------------|------------------|
| ক. সাম্যবাদিতার | খ. মানবপ্রেমের |
| গ. সংস্কারমুক্তির | ঘ. দৃঢ়বিশ্বাসের |

৪. কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আরবের লোকেরা - ছিল অসাধারণ?

ক. সহিংসতার

খ. ধৈর্যের

গ. পেশিশক্তির

ঘ. স্মৃতিশক্তির

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের কোনো অঙ্গিকা তাঁর ছিল না। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত। সকলের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল হাসিমাখা। ছোট ছেট শিশুদের তিনি খুব বেশি স্নেহ করতেন। তাঁর বালক-বন্ধুর সাথে দেখা হলে তিনি বন্ধুর বুলবুলি পাখির খবর নিতেও ভুলে যেতেন না।

ক. হযরত মুহাম্মদ (স.) কোন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন?

খ. মানুষের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আচরণ কীরণ ছিল - উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

গ. সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা উন্নয়নে রাসূল (স.) এর আদর্শ কর্তৃকু ফলদায়ক যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. বালক-বন্ধুর কাছে তিনি বুলবুলির খবর জানতে চাইলেন, এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় বিশ্লেষণ কর।

শব্দ থেকে কবিতা

হীমায়ুন আজাদ



কবিতা কাকে বলে, বলা খুব মুশকিল । কিন্তু আমরা যারা পড়তে পারি, তারা কম-বেশি কবিতা চিনি । কবিতারও চেহারা আছে । বইয়ে বা পত্রিকায় যে-সেখানগুলো খুব সুন্দরভাবে ছাপানো হয়, যে-সেখানগুলো, পঙ্কজিঙ্গলো খুব বেশি বড় হয় না, যে-গুলোতে একটি পঙ্কজি আরেকটি পঙ্কজির সমান হয়, সে-সেখানগুলোই কবিতা । যে-সেখানগুলো পড়লে মন নেচে উঠে; গান গেরে উঠতে ইচ্ছে করে, চোখে ঝুকে রং-বেরঙের স্বপ্ন এসে জমা হয়, তা-ই কবিতা । যা পড়লে, দু-তিনবার পড়লে আর ভোলা যায় না, মনের ভেতর যা নাচতে থাকে, তা-ই কবিতা ।

কবিতা কারা লেখেন? কবিনা লেখেন কবিতা । তাঁরা একটি শব্দের পাশে আরেকটি শব্দ বসিয়ে, একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দ মিলিয়ে কবিতা লেখেন । আমরা যদি কিছু বানাতে চাই, তাহলে কিছু-না-কিছু জিনিস লাগে । উপমা একটি শুড়ি বানাতে চায় । শুড়ি বানানোর জন্যে উপমার দরকার লাল-নীল কাগজ, সুতো, বাঁশের টুকরো । মৌলি একটি পুতুল বানাতে চায় । তার দরকার হলদে টুকরো কাপড়, সুতো, তিনটা লাল বোতাম, দুটো সরুজ কঁটা, একটু ছলো । তেমনি কবিতা বানাতে হলেও জিনিস চাই । কবিতার জন্যে দরকার শব্দ — রংবেরঙের শব্দ । ‘পাখি’ একটা শব্দ, ‘নদী’ একটা শব্দ, ‘ফুল’ একটা শব্দ, ‘মা’ একটা শব্দ; এমন হাজারো শব্দের দরকার হয় কবিতা লেখার জন্যে । কবি হতে পারে কে? সে-ই হতে পারে কবি, যে লিখতে পারে কবিতা, যার ভালোবাসা আছে শব্দের জন্যে । যে শব্দকে ভালোবাসে খুব, শব্দকে আদর করে করে

যে খুব সুখ পায়, সে-ই হতে পারে কবি। কবিরা গোলাপের মতো সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখেন। তুমিও গোলাপের মতো সুন্দর কথা বলতে চাও, চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখতে চাও? তোমার যদি শব্দের জন্যে আদর-ভালোবাসা না থাকে, তাহলে পারবে না তুমি গোলাপের মতো লাল গন্ধুরা কথা বলতে, চাঁদের মতো জ্যোৎস্নাভরা স্বপ্ন দেখতে।

তুমি কি লিখতে চাও ফুলের মতো কবিতা? বানাতে চাও নৃপুরের শব্দের মতো ছড়া? যদি চাও তবে তোমাকে সারাদিন ভাবতে হবে শব্দের কথা। খেলতে হবে শব্দের খেলা। নানান রকমের শব্দ আছে আমাদের ভাষায়। তোমাকে জানতে হবে সে-সব শব্দকে। কিছু কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর গায়ে হলুদ-সবুজ-লাল-নীল-বাদামি-খয়েরি রং আছে। তোমাকে চিনতে হবে শব্দের রং। অনেক শব্দ আছে, যেগুলোর শরীর থেকে সুর বেরোয়: কোনো কোনো শব্দে বাঁশির সুর শোনা যায়, কোনো কোনো শব্দে শোনা যায় হাসির সুর। কোনো শব্দে বাজে শুকনো পাতার খসখসে আওয়াজ, কোনোটিতে বেহালার সুর। কোনো কোনো শব্দ তোমার পায়ের নৃপুরের মতো বাজে। তোমাকে শুনতে হবে শব্দের সুর ও স্বর। অনেক শব্দ আছে বাঙলা ভাষায় যেগুলোর শরীর থেকে সুগন্ধ বেরোয়। কোনোটির শরীর থেকে ভেসে আসে লাল গোলাপের গন্ধ, কোনোটির গা থেকে আসে কঁঠালচাঁপার আণ, কোনোটি থেকে আসে বাতাবিলেবুর সুবাস। তুমি যদি দেখতে পাও শব্দের শরীরের রং, শুনতে পাও শব্দের সুর, টের পাও শব্দের সুগন্ধ, তাহলেই পারবে তুমি কবি হতে।

কবিরা শব্দ দিয়ে লেখেন নানান রকমের কবিতা। কখনো তাঁরা খুব হাসির কথা বলেন, কখনো বলেন কান্নার কথা। কখনো তাঁরা বলেন স্বপ্নের কথা, কখনো তাঁরা চারপাশে যা দেখেন, তার কথা বলেন। কিন্তু সব সময়ই তাঁরা কথা বলেন শব্দে। শব্দ বসিয়ে বসিয়ে তাঁরা বানান কবিতা। কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই জানতে হবে নানান রকমের শব্দ। তারপর আসে শব্দ দিয়ে যা বলতে চাই, তার কথা। কিন্তু কীভাবে বলা যায় সেই কথা?

কবিতায় আমরা অনেক কিছু বলতে পারি। কখনো বলতে পারি ঘর-ফাটানো হাসির কথা। বলতে পারি টগবগে রাগের কথা। বলতে পারি খুব চমৎকার ভালো কথা। কখনো বাজাতে পারি নাচের শব্দ। আবার কখনো আঁকতে পারি রঙিন ছবি। কিন্তু সব সময়ই মনে রাখতে হবে, ওই কথা নতুন হতে হবে। যা একবার কেউ বলে গেছে, যে-ছবি একবার কেউ এঁকে গেছে, তা বলা যাবে না, সে-ছবি আঁকা যাবে না। আর কথা বলতে হবে, নাচতে হবে, ছবি আঁকতে হবে ছন্দে। তাই কবিতা লিখতে হলে শব্দকে জানতে হবে, জানতে হবে ছন্দ, আর থাকতে হবে স্বপ্ন। যার চোখে স্বপ্ন নেই, সে কবি হতে পারে না। স্বপ্ন থাকলে মনে আসে নতুন ভাবনা, নেচে নেচে আসে ছন্দ, আর শব্দ।

যে কোনো বিষয় নিয়েই তুমি লিখতে পারো কবিতা। বাড়ির পাশের গলিটা, দূরের ধানক্ষেতটা, পোষা বেড়ালটা বা পুতুলটাকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি মনে স্বপ্ন থাকে। রাস্তার দোকানিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। আর যা নেই, তা নিয়েও কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। এবার একটা কবিতা লেখা যাক। কবিতাটির নাম দিচ্ছি ‘দোকানি’। রাস্তার মোড়ের দোকানদারকে তুমি-আমি চিনি। সে বিক্রি করে সাদা দুধ, খয়েরি চকোলেট, লাল পুতুল, সবুজ পান। এসব জিনিস আমরা কিনে খাই, দোকানিকে চকচকে টাকা দিই। তার জিনিসপত্র বিক্রি দেখে মাথায় আমার একটা ভাব এলো। ভাবটা হলো : আমি একটা দোকান খুলেছি দুদিন ধরে, কিন্তু সে-দোকানে দুধ, চকোলেট, পান বিক্রি হয় না।

বিক্রি হয় এমন সব জিনিস, যা কেউ বেচে না, যা কেউ কেনে না। শুধু স্বপ্নেই সে-সব জিনিস বেচাকেনা চলে। ভাবটা মাথায় এলো, সঙ্গে শব্দ এলো, আর ছন্দ এলো। প্রথমে লিখলাম :

দুদিন ধরে বিক্রি করছি
চকচকে খুব চাঁদের আলো
টুকুকে লাল পাখির গান।

কথাটাই চমক দেয় সবার আগে : চকচকে চাঁদের আলো, টুকুকে লাল পাখির গান বিক্রির ব্যাপারটা বেশ নতুন। সারা পৃথিবীতে খুঁজে এমন দোকান পাওয়া যাবে না। ছন্দটাও বেশ, দুলে দুলে আসছে। এ-তিনটি পঞ্জি পড়ার সাথে সাথে শব্দ, ছন্দ, কথা মিলে এক রকম স্বপ্ন তৈরি হয় চোখে আর মনে। এরপর আরও এগিয়ে গিয়ে লিখলাম :

বিক্রি করছি চাঁপার গন্ধ
স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দ
গোলাপ ফুলের মুখের রূপ।

এখানে ছন্দ-মিল আরও মধুর। বিক্রির জিনিসগুলো আগের মতোই চমকপ্রদ। তবে এখানে স্বপ্ন আরও বেড়েছে, ছবিও আরও রঙিন। চাঁপার গন্ধ পাওয়া গেল এবং বেজে উঠল স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দের নৃপুর। এ-নাচ স্বপ্ন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না, এমন নাচ নাচতে পারে না কেউ। ‘গোলাপ ফুলের মুখের রূপ’ বলার সাথে সাথে গোলাপ ফুল একটি মিষ্টি মেয়ের মতো ফুটে উঠল, মেয়েটির মুখ হয়ে উঠল গোলাপ, আর গোলাপ হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ। স্বপ্ন জড়ে হলো চোখে।

কবিতাটিকে আমি আর লিখতে চাই না। ইচ্ছে হলে তোমরা লিখতে পার। কবিতা লিখতে হলেই নতুন কথা ভাবতে হবে, আর সে-কথাকে পরিয়ে দিতে হবে শব্দ ও ছন্দের রঙিন সাজপোশাক। তোমরা এখন ছেট, এ-ছেট থাকার সময়টা বেশ সুন্দর। বারবার আমার ছেট সময়ের কথা মনে পড়ে। আমি দেখতে পাই, ছেট আমি দাঁড়িয়ে আছি পুকুরের পাড়ে, একটা সাদা মাছ লাফ দিয়ে আবার চুকে গেল পানিতে। দেখতে পাই শাপলা ফুটেছে, পানি লাল হয়ে গেছে। একটা চড়ুই উড়ে গেল, তার ঠোঁটে চিকন একটা কুটো। এসব আমাকে কবিতা লিখতে বলে।

তোমরা এখন ছেট, এ বয়সে তোমরা খুব বেশি করে দেখে নেবে। যত পার, দেখ, দেখ এবং দেখ। বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে ছবি জমাও, রং জমাও, সুর জমাও। বড় হলে এ ছবি, সুর, রং তোমাদের খুব উপকার করবে। খুব ছেট বয়সে কি কবিতা লেখা উচিত? ছেট বয়সে উচিত কবিতা পড়া, পড়া এবং পড়া। চারদিকের ছবি দেখা, দেখা এবং দেখা। ছেট বয়সে বুকে জমানো উচিত শব্দ আর ছন্দ। তারপর একদিন, যখন বড় হবে, শব্দ, ছন্দ, ছবি, সুর, রং সব দল বেঁধে আসবে তোমার কাছে, বলবে আমাদের তুমি কবিতায় রূপ দাও। তুমি হয়তো একা একা ঘরে বসে শব্দ-ছন্দ-ছবি-সুর-রং মিলিয়ে বানাবে এক নতুন জিনিস, যার নাম কবিতা।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

উপমা	-	তুলনা। এখানে একটি মেয়ের নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
নৃপুর	-	পায়ে পরার অলংকার।
চমকপ্রদ	-	যা অবাক করে দেয়।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল হতে অনুপ্রাণিত করা।

পাঠ-পরিচিতি

সাহিত্যের নানা রূপের মধ্যে একটি হচ্ছে কবিতা। রচনাটিতে কবিতার শিল্পরূপ ও তার বৈশিষ্ট্য অপরূপ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কাকে বলা যায় কবিতা? লেখকের মতে, যা পড়লে মনের ভিতর স্পন্দন জেগে ওঠে, ছবি ভেসে ওঠে, তা-ই কবিতা। শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে লেখা হয় কবিতা।

কেবল কবিরাই লিখতে পারেন কবিতা। কেননা কবিরাই স্পন্দন দেখতে পারেন, তাঁরাই পারেন স্পন্দনের ছবি আঁকতে। নতুন ছবি নতুন ভাব কেবল কবিদের চেতনায় খেলা করে বলে তাঁরা লিখতে পারেন কবিতা। কবিতা লিখতে হলে শব্দের রূপ-রং-গঞ্চ-বর্ণ-সূর ও ছন্দ চিনতে হয়, জানতে হয়। কবিরা চেনেন এবং জানেন শব্দের এসব মায়াবী রূপ। তাই তাঁরা লিখতে পারেন কবিতা।

অনেক বিষয় নিয়েই কবিতা লেখা যায়। তবে কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন স্পন্দন। যিনি স্পন্দন দেখতে জানেন না, তিনি লিখতে পারেন না কবিতা। স্পন্দন দেখার জন্য শৈশব-কৈশোরে পড়তে হবে কবিতার পর কবিতা, দুচোখ মেলে দেখে নিতে হবে যা-কিছু চোখে পড়ে, তার সবটা। অর্থাৎ কবিতা লেখার জন্য চাই অভিজ্ঞতা। কবিতার রূপ ও তার রচনা-কৌশল বর্তমান রচনার উপজীব্য।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী, ভাষাবিজ্ঞানী, উপন্যাসিক ও কবি হুমায়ুন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মুস্লীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: কাব্য—‘অলোকিক ইস্টিমার’, ‘জুলো চিতাবাঘ’, ‘সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে’, ‘কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু; উপন্যাস—‘ছাপান হাজার বর্গাইল’, গল্প—‘যাদুকরের মৃত্যু’, প্রবন্ধ—‘লাল নীল দীপাবলি’, ‘কতো নদী সরোবর’ ইত্যাদি।

হুমায়ুন আজাদ ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে মুত্যবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. তোমার পড়া কোনো কবিতা বা গল্প অবলম্বনে তোমার ভালো লাগা বা ভালো না-লাগাঞ্জলো যুক্তিসহকারে লেখ।
- খ. টেলিভিশন বা অন্য কোনো মিডিয়াতে তোমার দেখা কোনো নাটক নিয়ে একটি সমালোচনা লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই কোনটি জানতে হবে ?

- | | |
|---------|---------|
| ক. কথা | খ. কৌশল |
| গ. শব্দ | ঘ. ছব্দ |

২. ‘শুধু স্মপ্তেই সেসব জিনিস বেচা-কেনা চলে ।’ - এ বাক্যে বেচা-কেনা শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

- | | |
|------------------|------------------|
| ক. বিনিয়ম প্রথা | খ. ক্রয়-বিক্রয় |
| গ. দেনা-পাওনা | ঘ. আদান-প্রদান |

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ঢ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরির গান
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ ।

৩. কবিতাংশে ‘শব্দ থেকে কবিতা’ প্রবন্ধের কবিতা রচনার কোন দিকটির পরিচয় পাওয়া যায় ?

- | | |
|------------------|--------------------|
| ক. শব্দ প্রয়োগে | খ. ছন্দের ব্যবহারে |
| গ. সাবলীল ভাষা | ঘ. উপমার প্রয়োগ |

৪. উপর্যুক্ত বিষয়টি নিচের কোন কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ক. ছবিও আরও রঙিন | খ. দুলে দুলে আসছে |
| গ. খেলতে শব্দের খেলা | ঘ. যত পারো দেখ |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. মাহফুজা চমৎকার কবিতা লেখেন। জীবনে বিভিন্ন অংশের স্মৃতিকে শব্দের ভেতর সাজাতে পছন্দ তাঁর। মাহফুজার ভাইপো নির্বার তাঁকে খুব পছন্দ করে। কারণ তিনি তাঁর ভাইপো নির্বারকে প্রায়ই নানা রকম কবিতা শোনান। নির্বার ফুফুকে পেলেই ছড়া শোনার বায়না ধরে। একদিন নির্বার তাঁকে বলে “ফুফু তুমি এতো সুন্দর কবিতা কীভাবে লেখ?” মাহফুজা উত্তর দেন, “তুমি তোমার চারপাশের সুন্দর স্মৃতিগুলোকে বুঝে ধারণ করে রাখবে, দেখবে তুমিও একদিন চমৎকার কবিতা লিখতে পারবে।”

ক. কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই কোনটি প্রয়োজন ?

খ. ‘কবিতার জন্য দরকার শব্দ – রংবেরঙের শব্দ’ – বুঝিয়ে লেখ ।

গ. কবিতার বিষয়ে নির্বারের প্রশ্নের উত্তর ‘শব্দ থেকে কবিতা’ প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে – লেখ ।

ঘ. মাহফুজার উত্তর ‘শব্দ থেকে কবিতা’ প্রবন্ধের মূলভাবকে ধারণ করে কি?” যুক্তিসং বিচার কর ।

পাখি লীলা মজুমদার

ডান পাটা মাটি থেকে এক বিষ্঵ত ওঠে, তার বেশি ওঠে না। কুমু তা হলে চলে কী করে?

মাসিরা মাকে বললেন—“কিছু ভাবিসনে, রোগ তো সেরেই গেছে, এখন ওকে ঝাড়া তিন মাস সোনাবুরিতে মার কাছে রেখে দে, দেখিস কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠবে।”

বাবাও তাই বললেন, “বাঃ, তবে আর ভাবনা কী, কুমু? তা ছাড়া ওখানে ওই লাটু বলে মজার ছেলেটা আছে, হেসে খেলে তোর দিন কেটে যাবে।”

কিন্তু পড়া? কুমু যে পড়ায় বড় ভালো ছিল। তা তিন মাস গেছে শুয়ে শুয়ে, তিন মাস গেছে পায়ে লোহার ফ্রেম বেঁধে হাঁটতে শিখে। আরও তিন মাস যদি যায় দিদিমার বাড়িতে, তবে পড়া সব ভুলে যাবে না?

মা বললেন, “পড়ার জন্য অত ভাবনা কীসের? লাটুর বাড়ির মাস্টার তোমাকেও পড়াবেন।”

মাসিরা বললেন, “বেঁচে উঠেছিস এই যথেষ্ট, তা না হয় একটা বছর ক্ষতিই হলো, তাতে কী এমন অসুবিধেটা হবে শুনি?”

হাসি, রত্না সবাই ওপরের ক্লাসে উঠে যাবে, কুমু পড়ে থাকবে, ভাবলেও কান্না পায়। কুমুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

সোনাবুরিতে দিম্বার বাড়ির দোতলার বড় ঘরে, মন্ত জানালার ধারে আরামচেয়ারে বসে বসে চেয়ে দেখে দূরে একটা বিল, সেখানে হাজার হাজার বৃষ্টির জলের ফেঁটা পড়ছে আর অমনি বিলের জলে মিশে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে পাটা আবার একটু তুলতে চেষ্টা করে কুমু।

সঙ্গে হয়ে আসছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, বিলের জল সাদা চকচক করছে।

আকাশ থেকে হঠাত ছায়ার মতো কী বিলের ওপর নেমে এল। কুমু দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা ফিকে ছাই রঙের বুনো হাঁস ঝুপঝাপ করে জলে নামছে।

এক ছড়া কী যেন সাদা ফুল হাতে নিয়ে লাটু এসে বলল, “ওই দেখ, বুনো হাঁসরা আবার এসেছে। শিকারিদের কী মজা! ইস, আমার যদি একটা এয়ারগান থাকত।”

কুমু বলল, “বন্দুক নেই ভালোই হয়েছে। অমন সুন্দর পাখিও মারতে ইচ্ছে করে!”

দিম্বাও তখন ঘরে এসে বললেন, “হ্যাঁ, ওদের ওই এক চিন্তা!”

কুমু বলল, “কোথেকে এসেছে ওরা?”

“যেই শীত পড়ে অমনি উত্তরের ঠাণ্ডা দেশ থেকে ঝাঁকে উড়ে আসে, বাঁধের কাছে দু-তিন দিন বিশ্রাম করে, তারপর আবার দক্ষিণ দিকে উড়ে যায়, শোনা যায় নাকি সমুদ্রের ওপর দিয়ে আন্দামান অবধি উড়ে যায় কেউ কেউ।”

লাটু কাছে এসে ফুলটা কুমুর খাটে রেখে বলল — “আবার শীতের শেষে ঝাঁকে ঝাঁকে সব ফিরে আসে, সেকথা তো বললে না ঠাকুরমা?”

লাটুর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দূরে দূম দূম করে বন্দুকের গুলির শব্দ হলো, আর বুনো হাঁসের ঝাঁক জল ছেড়ে আকাশে উড়ে খুব খানিকটা ডাকাডাকি করে আবার জলে নামল।

পরদিন সকালে জানালা খুলে, পর্দা টেনে দিম্বা চলে গেলে, কুমু জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে লেবু গাছের পাতার আড়ালে, ডাল ঘেঁষে কোনোমতে আঁকড়ে-পাকড়ে বসে রয়েছে ছোট একটা ছাই রঞ্জের বুনো হাঁস। সরু লম্বা কালো ঠেঁট দুটো একটু হাঁ করে রয়েছে, পা দুটো একসঙ্গে জড়ে করা, বুকের রঞ্টা প্রায় সাদা, চোখ দুটো একেবারে কুমুর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে, কালো মখমলের মতো দুটো চোখ। একদিকের ডানা একটু ঝুলে রয়েছে, খানিকটা রক্ত জমে রয়েছে, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

পাখিটাকে দেখে কুমুর গলার ভেতরে টন্টন করতে থাকে; হাত বাঢ়িয়ে বলে, “তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই।” পাখিটা চোখ বন্ধ করে, আবার খোলে। আর একটু ডাল ঘেঁষে বসে।

লাটু কুমুর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে পাখিটাকে দেখতে পায়। ইস! ডানায় গুলি লেগেছে বেচারার। চুন হলুদ দিয়ে বেঁধে দিলে সেরেও যেতে পারে। বলিস তো ধরে আনি।”

কুমু বলল, “কিষ্টি দিম্বা কী বলবেন?”

“কী আবার বলবেন? বলবেন ছি, ছি, ছি, নোংরা জিনিস ফেলে দে, ওসব কি বাঁচে।”

কুমু জোর গলায় বলল, “নিশ্চয় বাঁচে, চুন হলুদ দিয়ে ডানা বেঁধে, গরম জায়গায় রাখলে নিশ্চয় বাঁচে।”

লাটু বলল, “কোন গরম জায়গায়?”

“কেন আমার বিছানায়, লেপের মধ্যে।”

“দেখিস, কেউ যেন টের না পায়।”

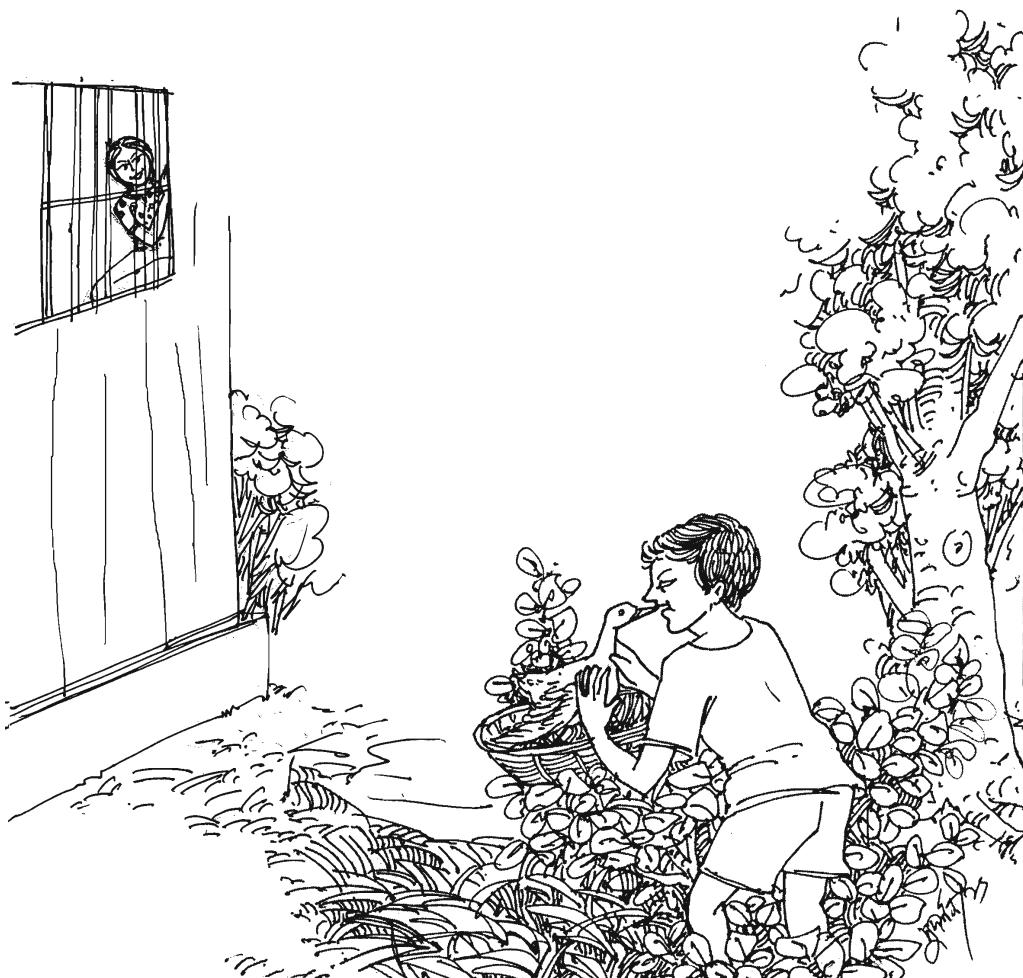
“কী করে টের পাবে, আমার বিছানা তো আমি নিজে করি। ডাক্তার আমাকে হাত-পা চালাতে বলেছে যে। আচ্ছা, ধরতে গেলে উড়ে পালাবে না তো?”

“তোর যেমন বুদ্ধি। এক ডানায় ওড়া যায় নাকি?”

“কী খাবে ও লাটু?”

লাটু ভেবে পায় না খাটের মধ্যে বিছানার ভিতরে কী খাওয়াবে ওকে। না খেয়ে যদি মরে যায়!

“এক কাজ করলে হয় না রে কুমু? বুড়ি দিয়ে, লেবু গাছের ডালে ওর জন্য একটা বাসা বেঁধে দিই, তা হলে ভাঙা ডানা নিয়ে আর পড়ে যাবে না, নিজেই পোকামাকড় ধরে খাবে।”



নিমেষের মধ্যে ঝুঁড়ি নিয়ে লাটু জানালা গলে একেবারে লেবু গাছের ডালে। ভয়ের চোটে পাখিটা পড়ে যায় আর কী! লাটু তাকে থপ করে ধরে ফেলে, কিষ্ট কী তার ডানা বাটপটানি, ঠুকরে ঠুকরে লাটুর হাত থেকে রক্ষ বের করে দিল। লাটু দড়ি দিয়ে শক্ত করে ঝুঁড়ি বেঁধে পাখিটাকে আস্তে আস্তে তার মধ্যে বসিয়ে দিল। অমনি পাখিটা আধমরার মতো চোখ বুঁজে ভালো ডানাটার মধ্যে ঠোট গুঁজে দিল।

লাটু সে জায়গাটাতে নিজের পা কাটার সময়কার হলদে মলম লাগিয়ে দিয়ে আবার জানালা গলে ঘরে এল। বলল, “ঠাকুরমার কাছে যেন আবার বলিস না। বলবেন হয়তো, ছুঁস না ওটাকে।”

কুমু হাঁটতে পারে না ভালো করে, পাখিটাও উড়তে পারে না। পারলে নিশ্চয় ওই দূরে বিলে ওর বন্দুদের কাছে চলে যেত। গাছের ডালে ঝুঁড়িতে ডানায় মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে থাকত না। কুমুর পা ভালো হলে কুমুও এখানে থাকত না। মার কাছে থাকত, রোজ ইস্কুলে যেত, সঙ্ক্ষেবেলায় সাঁতার শিখত, দৌড় খেলার জন্য রোজ অভ্যস করত। আর কোনোদিনও হয়তো কুমু দৌড়াতে পারবে না। কিছুতেই আর পায়ে জোর পায় না, মাটি থেকে ওই এক বিঘতের বেশি তুলতে পারে না। মনে হয় অন্য পাটার চেয়ে একটা একটু ছোট হয়ে গেছে।

আর একবার জানালার কাছে গিয়ে পাখিটাকে দেখে ভালো করে, ও ডানাটাকে যে নাড়া যায় না সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। পাখিটা ঝুঁড়িতে বসে আস্তে আস্তে কালো ঠোঁট দিয়ে বুকের পালক পরিষ্কার করছে। তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁটে ভর দিয়ে চুপ করে চোখ বুঁজে পড়ে থাকল; তারপর আবার চোখ খুলে গাছের ডাল থেকে কী একটা খুঁটে খেল।

কুমু বালিশের তলা থেকে ছোট বিস্কুটের বাল্ক থেকে একটুখানি বিস্কুট ছুঁড়ে দিল। পাখিটাও অমনি যেন পাথর হয়ে জমে গেল। বিস্কুটের দিকে ফিরেও চাইল না। কুমু আবার খাটে এসে বসল, নতুন গল্পের বইটা পড়তে চেষ্টা করল। পনেরো মিনিট বাদে আর একবার জানালা দিয়ে উঁকি মারল। বুকের পালক পরিষ্কার করতে করতে পাখিটা আবার কী একটা খুঁটে খেল।

গাছের ডালে পাখিটা একটু নড়ছে, একটু শব্দ হচ্ছে, কুমু ভয়ে কাঠ, এই বুঝি দিম্বা দেখতে পেয়ে মঙ্গলকে বলেন, “ফেলে দে ওটাকে, বড় নোংরা, ঝুঁড়ি খুলে আন, ওটা কে বেঁধেছে ওখানে?”

কুমু জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে পাখিটা ঘুমিয়ে আছে। কুমুও বই নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুল। হঠাৎ জানালার বাইরে শোরগোল। চমকে উঠে দেখে একটা হলদে বেড়াল গাছের ডালে গিয়ে উঠছে। কুমু ভয়ে কাঠ; এই বুঝি বেড়াল পাখিটা খেল। কিন্তু খাবে কী, অত বড় পাখি তার তেজ কত! দিলো ঠুকরে ঠেলে ভাগিয়ে। দুটো কাক দূর থেকে মজা দেখল, কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

কুমু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এ মাথা থেকে ও মাথা হেঁটে বেড়াতে লাগল, খোঁড়া তো হয়েছে কী, এইরকম করে হাঁটলেই না পায়ের জোর বাঢ়বে। দু-বার হেঁটে কুমু এসে যখন খাটে বসল, পা দুটোতে ব্যথা ধরে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ডান পাটা এক বিঘতের চেয়ে একটু বেশিই তোলা যাচ্ছে।

এমনি করে দিন যায়, বুনো হাঁসের ডানা আস্তে আস্তে সারতে থাকে। দু-দিন পরে পাখির ঝাঁক বিল থেকে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল। গাছের ডালে বসে পাখিটা একটা ডানা ঝাপটাতে লাগল। উড়বার জন্য কী যে তার চেষ্টা! কিন্তু ভাঙ্গা ডানা ভর সইবে কেন, হাঁসটা ঝুঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে নিচের ডালের ফাঁকে আটকে থাকল। লাটু তখনও স্কুল থেকে ফেরেনি, কুমু করে কী! জানালার ধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল, পাখিটা অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে ঝুলে থাকার পর আঁচড়ে-পাঁচড়ে নিজেই সেই ডালটার উপর চড়ে বসল। লাটু ফিরে এসে আবার ওকে তুলে ঝুঁড়িতে বসিয়ে দিল। ঠোকরালও একটু সে, তবে তেমন কিছু নয়, ডানায় আবার ওমুখ লাগিয়ে দিল লাটু।

এমনি করে দিন যায়, রোজ পাখিটা একটু করে সেরে ওঠে, ঝুঁড়ি থেকে ডালে নামে। আর আনন্দের চোটে কুমুও ঘরময় হেঁটে বেড়ায়, নিজের বিছানা নিজে পাতে, নিজে শ্লান করে, জামা কাচে। দুপুরবেলা এক ঘূম দিয়ে উঠে নিজে বসে অঙ্গ কষে। বাড়িতে চিঠি লেখে, “মা বাবা, তোমরা ভেবো না, আমি রোজ রোজ সেরে উঠছি, রঞ্জাদের বলো আমি পরীক্ষা দেব।”

এমনি করে এক মাস কাটল। তার মধ্যে একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল। পাখিটা ঝুঁড়ির তলার গাছের ডালের আড়ালে গিয়ে লুকাল। তারপর বৃষ্টি থেমে আবার যখন রোদ উঠল, পাখিটা দিব্য ডানা মেলে পালক শুকোল। কুমু অবাক হয়ে দেখল ডানা সেরে গেছে।

তার দু-দিন পরে দুপুরে মাথার অনেক ওপর দিয়ে মন্ত এক ঝাঁক বুনো হাঁস তীরের মতো নকশা করে উড়ে গেল। কুমুর পাখিও হঠাত কী মনে করে ডাল ছেড়ে অনেকখানি উঁচুতে উড়ে গেল, কিন্তু তখুনি আবার নেমে এসে মগডালে বসল। হাঁসরাও নামল। পাখিটা সেই দিকেই চেয়ে থাকল।



সারা রাত বুনো হাঁসরা বিশ্রাম করে পরদিন সকালে যখন দল বেঁধে আকাশে উড়ল, কুমুর পাখিও তাদের সঙ্গ নিল। দল থেকে অনেকটা পেছিয়ে থাকল বটে, কিন্তু ক্রমাগত যেরকম উড়তে লাগল, কুমু লাটুর মনে কোনো সন্দেহ রইল না, এখুনি ওদের ধরে ফেলবে।

সে বিকেলে কুমু নিজে হেঁটে নিচে নামল, ডান পাটা মেন একটু ছোটই মনে হলো।

কুমু বলল, “দিম্মা, পাটা একটু ছোট হলেও কিছু হবে না, আমি বেশ ভালো চলতে পারি। বুনো হাঁসটারও একটা ডানা একটু ছোট হয়ে গেছে।”

শুনে দিম্মা তো অবাক! তখন লাটু আর কুমু দুজনে মিলে দিম্মাকে পাখির গল্ল বলল। দিম্মা কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, “ওয়া, বলিসনি কেন, আমিও যে পাখি ভালোবাসি।”

(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

শব্দার্থ ও টীকা

- | | |
|-----------|--|
| দিম্মা | — এখানে দিদিমাকে ‘দিম্মা’ বলে সম্মোধন করা হয়েছে। |
| এক ছড়া | — এক গুচ্ছ। |
| আন্দায়ান | — ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ভারতের একটি দীপাঞ্চল। সমুদ্রবেষ্টিত এ অঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। |
| অবধি | — পর্যন্ত। |
| একদৃষ্টে | — এক দৃষ্টিতে, অর্থাৎ চোখের পলক না ফেলে। |

নিমেষ	— মূর্তি ।
বিষত	— আধা হাত পরিমাণ ।
শোরগোল	— চিত্কার, চেঁচামেচি ।
আঁচড়ে-পাঁচড়ে	— অনেক চেষ্টা করে ।
মগডাল	— উপরের ডাল ।

পাঠের উদ্দেশ্য

প্রাণীদের প্রতি শিক্ষার্থীদের মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলা ।

পাঠ-পরিচিতি

‘পাখি’ গল্পটি লীলা মজুমদারের ‘চিরকালের সেরা’ গল্প-সংকলন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গল্পের কিশোরী কুমু অসুস্থ হলে তা নিয়ে দৃশ্যত্বায় পড়ে পরিবার। সহপাঠীরা সবাই উপরের ক্লাসে উঠে যাবে, কুমু নিচের ক্লাসে পড়ে থাকবে — এই নিয়ে কুমুর ভাবনার শেষ নেই। দ্রুত সুস্থতার জন্য কুমু সোনাবুরিতে দিদিমার দোতলা বাড়ির উন্মুক্ত পরিবেশে এলে একটি অভূতপূর্ব ঘটনার সম্মুখীন হয়।

শিকারির বন্দুকের গুলির আঘাতে একটি বুনোহাঁস আহত হলে কুমু তার জন্য সাহায্যের হাত বাঢ়িয়ে দেয়। পাখিটিকে সুস্থ করে তোলার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সমবয়সী কিশোর লাটুর সহযোগিতা নিয়ে কুমু পাখিটিকে সকল বিপদ থেকে বাঁচতে এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। গল্পটির একটি অসাধারণ দিক হচ্ছে — পাখিটির সেরে ওঠার প্রতিটি ধাপ থেকে কুমু নিজেও সুস্থ হবার প্রেরণা পায়। পাখিটির প্রতি দুজন কিশোর-কিশোরীর অক্ত্রিম মমত্ববোধ ও সমবেদনা গল্পটিকে এক অনন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে।

লেখক-পরিচিতি

লীলা মজুমদার ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার বিখ্যাত রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি পৈতৃক নিবাস বৃহত্তর ময়মনসিংহে। তিনি শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভাই। শিশু-কিশোরদের জন্য লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ। তাঁর লেখা বিখ্যাত কিছু বই: ‘হলদে পাখির পালক’, ‘দিনদুপুরে’, ‘বদ্যনাথের বড়ি’ ‘গুপির গুপ্তখাতা’। আকাশ-হোঁয়া কল্পনা, নির্মল হাস্য-কৌতুক এবং গল্প বলার চঙের কারণে শিশু-কিশোর সাহিত্যে তিনি এক ঝৰ্ণায় আসন তৈরি করেছেন। ২০০৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. তোমার পছন্দের প্রাণীসমূহের তালিকা কর ।
- খ. বিভিন্ন সময় মানুষেরা কোন কোন প্রাণীর প্রতি কী ধরনের বিরুদ্ধ আচরণ করে থাকে ?
- গ. প্রাণীদের প্রতি উপযুক্ত মমত্ববোধ দেখানোর জন্য আমাদের আচরণে কী কী পরিবর্তন আনা উচিত ?

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কুমুর ধারণা অনুযায়ী দিদিমা কাকে পাখিটি ফেলে দিতে বলবেন -

- | | | | |
|----|------|----|--------|
| ক. | মা | খ. | মঙ্গল |
| গ. | লাটু | ঘ. | মাসীমা |

২. লাটু পাখিটির ডানায় চুন-হলুদ বেঁধে দেয়। কারণ এটি -

- i. ক্ষত স্থানের জন্য উপকারী
- ii. পাখিটির ডানা রঙিন করবে
- iii. গ্রামীণ চিকিৎসা পদ্ধতি

কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | ii ও iii |
| গ. | i ও ii i | ঘ. | i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কবুতর পোষার শখ কামালের। শুরুতে এক জোড়া কবুতর সে খাঁচাতেই পুষত। বলতে গেলে একসময় এটা নেশায় দাঁড়িয়ে যায়। তাই কবুতরের আরামদায়ক বসবাসের জন্য কাঠের খোপ বানিয়ে দেওয়ালে টানিয়ে দিয়েছে কামাল। এখন তার পাঁচ জোড়া কবুতর।

৩. উদ্দীপকে ‘পাখি’ গল্লের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

- | | |
|----|--------------------------|
| ক. | পাখি পোষার শখ |
| খ. | পাখির প্রতি মমত্বোধ |
| গ. | পাখির প্রতি সমবেদনা |
| ঘ. | পাখির পরিচর্যার ব্যবস্থা |

৪. উক্ত প্রতিফলিত দিকটি ‘পাখি’ গল্লের কোন চরিত্রসমূহে বিদ্যমান ?

- i. মা-দিদিমা
- ii. কুমু-লাটু
- iii. লাটু-দিদিমা

কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|---------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | ii ও iii |
| গ. | i ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

সুজনশীল প্রশ্ন

১. সহপাঠীদের সাথে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি বিড়াল ছানার করণ ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় শ্রেয়সী। হঠাৎ দেখে রাস্তার পাশে একটি গর্তে একটি বিড়াল ছানা আটকে আছে। বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে শ্রেয়সী সেটিকে পরিষ্কার করে কোলে তুলে নেয়। বাড়িতে ফেরার পর শ্রেয়সীর সেবা-যত্নে বিড়াল ছানাটি যেন প্রাণ ফিরে পেল। খুব অল্প সময়ে সে তাদের পরিবারেরই একজন হয়ে উঠল। কিন্তু ওর ভাই সুজা তাকে সহ্য করতে পারত না, আয়ই মারধর করতো। একদিন শ্রেয়সী স্কুল থেকে ফিরে বিড়াল ছানাটিকে আর খুঁজে পেল না।

- ক. হাঁসরা গিয়ে কোথায় নামল ?
- খ. কুমু-লাটুর মনে কোনো সন্দেহ রইল না কেন ?
- গ. শ্রেয়সীর মাধ্যমে ‘পাখি’ গল্পের কোন বিশেষ দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘সুজার মানসিকতা কুমু বা লাটুর মতো হলে বিড়াল ছানাটিকে হারাতে হতো না শ্রেয়সীর’-বিশেষণ কর।

পিতৃপুরুষের গল্প

হারুন হাবীব

অন্তর মামা বড় বেশি একটা ঢাকা শহরে আসেন না। ওর মা চিঠি লিখে কত বলেন, কাজল তুই ঢাকা শহরে চলে আয়। আমার বাসাতেই থাকবি যদিন চাকরি না হয়। কাজল মামা তবু আসে না। গ্রাম নাকি খুব ভালো লাগে কাজল মামার।

১৯৭১ সালে কাজল মামা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। পড়তে পড়তেই বেঁধে গেল যুদ্ধ। একদিন ঢাকা ছেড়ে হঠাতে সে গ্রামে এসে হাজির। তারপর রাতদিন এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে ছেলেদের জোগাড় করে মিছিল মিটিং। রাইফেল জোগাড় করে ট্রেনিং। আরও কত কি। অন্তর নানা কত বকতেন, ‘বাবা, এসব করিস নে। বিপদে পড়বি।’

‘বাঘা বাঙালিরা এবার যুদ্ধ করবে, বাবা। স্বাধীনতা এবার আসবেই।’ সাহস নিয়ে বলত কাজল মামা।

সেই কাজল মামার যুদ্ধের গল্প শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে অন্ত। বার্ষিক পরীক্ষার পর থেকেই। মা ওকে বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছে, ‘তুই এক কাজ কর অন্ত। চিঠি লেখ মামাকে। বল, এবারের একুশে ফের্ব্রুয়ারিতে যেন অবশ্যই ও ঢাকা আসে। আরও বল, তুই যুদ্ধের গল্প শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছিস। দেখবি ঠিক আসবে।’

বুদ্ধিটা অন্তর মা’র হলেও এমন একটা কৌশল চিন্তা করত সে বেশ ক’দিন আগে থেকেই। কাউকে না জানিয়ে অন্ত চিঠি লিখেছে। সেও প্রায় দশ-বারো দিন হয়ে গেছে। আজ আঠারো তারিখ। তিনি দিন বাদেই মহান একুশে ফের্ব্রুয়ারি। ওর কেন যেন বিশ্বাস কাজল মামা আর কারও কথা শুনুক না শুনুক তার কথা রাখবেই, আসবেই সে ঢাকা।

অন্ত বরাবর রাত ন’টা-সাড়ে ন’টায় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ রাতে সে দশটারও ওপরে জেগে থাকল। মা বললেন, ‘যুমাতে যাস নে কেন?’

অন্ত খুলে বলে না কিছু। এগারোটা বাজতেই কিন্তু ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে ওর। লেপের নিচে চুকতে চুকতেই সে কী গভীর ঘূম।

তোরবেলায় সে দেখল কাজল মামা তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। লেপ থেকে বেরিয়ে এক লাফে উঠে বসল সে বিছানায়।

মামা বললেন, ‘ভালো আছিস তুই অন্ত? শেষ রাতের ট্রেনে এলাম। এসে দেখি তুই ঘুমাচ্ছিস।’ অন্ত বলে, ‘আজ কিন্তু উনিশ তারিখ, তা তো জানো মামা। দুঁদিন বাদেই একুশে ফের্ব্রুয়ারি।’

মামা বললেন, ‘ঠিক আছে খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়েই বেরুবো তোকে নিয়ে। যেখানেই যেতে চাস সেখানেই যাব। পাঁচ দিন আমি ঢাকায় থাকব — এর মধ্যে চার দিনই তোর সাথে। যেখানে যেতে চাবি যাব। যত গল্প শুনতে চাস শোনাব।’

মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোড থেকে একটি রিকশায় চাপল অন্ত আর কাজল মামা। লালমাটিয়া-ধানমণি হয়ে রিকশা চলছিল। মামা বললেন, ‘এই যে রাস্তাটা দিয়ে আমরা যাচ্ছ এর নাম সাতমসজিদ রোড। জানিস?’

‘কি যে বলো মামা। জানব না কেন।’



‘ঠিক আছে বল দেখি সাতমসজিদ নাম হয়েছে কেন রাস্তাটার?’

‘তা তো ঠিক জানি না।’

‘এই জন্যই বলছিলাম, অতীতের অনেক জিনিসই জেনে রাখা ভালো আমাদের। অতীত মানে আমাদের আগের দিন। পুরনো দিনের ওপরেই তো বর্তমানের দিন-রাত গড়ে ওঠে।’

কাজল মামা সংক্ষেপে বললেন। এই ঢাকা শহরের আগের নাম জাহাঙ্গীরনগর। মোগল বাদশা জাহাঙ্গীরের নামে। সেই সময় থেকেই শহরের আনাচে-কানাচে অনেক মসজিদ তৈরি হতে থাকে। এই রাস্তাটা পিলখানার মোড় থেকে মোহাম্মদপুর এসে সাতগম্বুজ মসজিদে ঠেকেছে। সেই পুরনো মসজিদের নামেই রাস্তাটার নাম হয়েছে সাতমসজিদ রোড।

রিকশাটা নিউমার্কেট পেরিয়ে নীলক্ষেত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে চুকতেই অন্ত জিভেস করল, ‘তুমি নাকি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে মামা?’

‘হ্যাঁ, পড়তাম একদিন। তুই জানলি কী করে?’

‘মা বলছিল তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়তে তখনই যুদ্ধে গিয়েছ।’

‘অন্ত, যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাত। যুদ্ধ হয় রাজায় রাজায় এক দেশে আরেক দেশে, মানুষের লোভ লালসায়। যুদ্ধে শক্তি দেখায় একজন মানুষ — কষ্ট হয় সাধারণ মানুষের। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হয় স্বাধীনতার জন্য, একটি জাতি হিসেবে বেঁচে থাকবার জন্য, সব অন্যায় অত্যাচার আর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য। একান্তর সালে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম — সাধারণ যুদ্ধ নয়।’

দেখতে দেখতে রিকশাটা রোকেয়া হল আর শামসুন্নাহার হল পেরিয়ে জগন্নাথ হলের সামনে এসে পৌছাল। কাজল মামা বললেন, ‘এই যে ডান পাশে বিস্তৃত দেখছিস ওটার নাম কি জানিস?’

‘না।’

‘জগন্নাথ হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা থাকে।’

‘তুমি থাকতে এখানে?’

‘না। আমি থাকতাম হাজী মোহাম্মদ মহসীন হলে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই হলের কয়েক শত ছাত্রকে ওই মাঠটাতে একসাথে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছিল।’

‘কেন?’

‘কারণ পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা আমাদের বাংলাদেশটাকে গোলাম করে রাখতে চেয়েছিল। আর ছাত্রের যেহেতু তরুণ এবং পাকিস্তানিদের সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করত, সেহেতু ওদের গুলির শিকার হলো ওরাই প্রথম।’

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সামনে এসে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন কাজল মামা। দু'দিন বাদেই মহান একুশে ফেরুয়ারি। মামা বললেন, ‘অন্ত এই পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত জাতি বা গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। ওদের মধ্যে যারা স্বাধীন হয়েছেন তাদের সেই স্বাধীনতা লাভের পেছনে প্রচুর ত্যাগ-তিতিক্ষা আছে। অনেক রক্তের ইতিহাস আছে। হাজারো লক্ষ প্রাণদানের কর্ম কাহিনি আছে। আর সেইসব রক্তের স্মৃতিকে ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য ধরে রাখতে গিয়েই দেশে এই শহিদ মিনারের মতো স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।’

মামাকে বলে, ‘মামা এবার কি তুমি ফুল দিতে আসবে শহিদ মিনারে?’

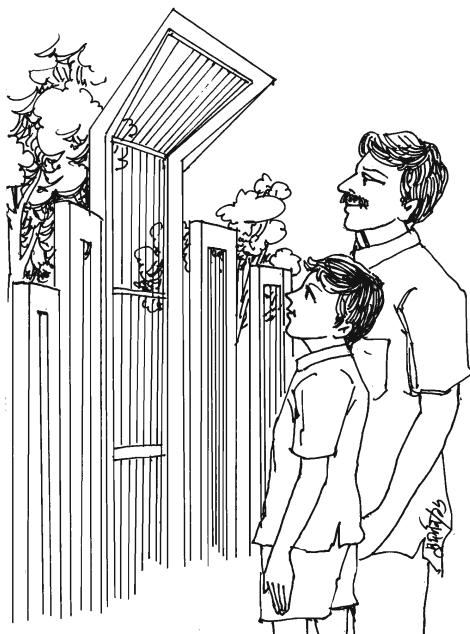
‘আসব। গ্রামে থাকি, অনেক বছর আসতে পারি নি। এবার তোকে নিয়েই আসব। বলতো অন্ত, শহিদ মিনার বাঙালির স্মৃতিসৌধ কেন?’

‘মায়ের ভাষা বাংলাকে রক্ষা করতে গিয়ে এখানে অনেক বাঙালি প্রাণ দিয়েছিল একদিন।’

অন্তর স্পষ্ট উত্তরে কাজল মামা খুব খুশি হলেন। বললেন, ‘তুই তো বেশ কিছু জানিস অন্ত। তোর উত্তরে খুব খুশি হয়েছি আমি। এই শহিদ মিনার হলো আমাদের ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মৃতির মিনার। পাকিস্তানের শাসকেরা আমাদের বাঙালিদের ওপর তাদের উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালিরা তা মেনে নেয় নি। তাই ১৯৫২ সালের একুশে ফেরুয়ারিতে ঠিক এই জায়গাটায় যখন তাঁরা উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল তখনই পাকিস্তানি পুলিশ গুলি করে অনেককে হত্যা করেছে।’

চাপ চাপ রক্তে এই জায়গার মাটি ভিজে গেছে। ওই রক্তের বিনিময়েই আমরা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।’

অন্তর মুখ দেখে কাজল মামা বুঝালেন সে মন খারাপ করেছে। মানুষ মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে এ ব্যাপারটা কিছুতেই মনে নিতে পারে না অন্ত। মামাকে বলে, ‘মামা, তুমি তখন এখানে ছিলে?’



‘নারে পাগল। আমি তো তখন তোর মতোই ছোট। এখানে যাঁরা বাহান সালে রক্ত দিয়েছেন তাঁরা সবাই আমার বড়। ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ — ওদের আমরা চিরদিন মনে রাখব — শ্রদ্ধা করব।’

কাজল মামার হাত ধরে অন্ত একের পর এক সিঁড়ি ডিঙিয়ে শহিদ মিনারের ওপরে ওঠে। মামার কাছে একুশে ফেরুয়ারির কাহিনি শুনে সে আগ্রহী হয় নিজ জাতির অতীত সংগ্রামের আরও কাহিনি শুনতে। কেউ তো আগে এমন করে বলে নি তাকে। অথচ কত কাহিনি আছে বাঙালি জাতির। অন্ত বলে, ‘তুমি আমাকে আরও কাহিনি বলো মামা।’

‘একুশে ফেরুয়ারির দিন যখন ফুল দিতে আসবি সেদিন আরও বলব। আজ শুধু এটুকুই বলি — এই একুশে ফেরুয়ারির শহিদেরা হচ্ছে আমাদের জাতির প্রথম শহিদ। ওরা রক্ত দিয়েছিল বলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়েছিল। শুধু তা-ই নয় একুশে ফেরুয়ারি থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের স্বাধীনতার মূল সংগ্রাম শুরু হয়। সেই সংগ্রাম আরও উনিশ বছর ধরে চলে। এই উনিশ বছরে অসংখ্য মানুষ মারা যায়, অনেক মায়ের কোল খালি হয়ে যায়। তারপর আসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।’

‘হঁয়া আমি ছিলাম সেই মুক্তিযুদ্ধে।’

‘বলতে হবে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গল্প। বাসায় ফিরে দুপুরের খাবার খেয়েই বলবে। ঠিক তো?’

‘ঠিক।’

শহিদ মিনার থেকে নেমে কাজল মামা আর অন্ত জুতো পরে নেয়। ফিরে আসার সময় মামা বলেন, ‘অন্ত চল, আমরা দুঁজনে এক মিনিট দাঁড়িয়ে একুশে ফেরুক্ক্যারির শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই।’

অন্ত ও কাজল মামা নীরবে শ্রদ্ধা জানায়।

(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

শব্দার্থ ও টীকা

হানাদার বাহিনী — অন্যায়ভাবে আক্রমণকারী বাহিনী। এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বোঝাচ্ছে।
এই বাহিনী বাংলার নিরীহ জনগণের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।

তিতিক্ষা — সহনশীলতা।

সামরিক শাসন — সামরিক বাহিনী দ্বারা যখন রাষ্ট্রের শাসন পরিচালিত হয় তখন সেই শাসনকে
সামরিক শাসন বলা হয়।

পিতৃপুরুষ — পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ, জাতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা।

পাঠ-পরিচিতি

‘পিতৃপুরুষের গল্প’ গল্পটির কিশোর অন্ত ঢাকায় বসবাস করে। মায়ের কাছে মুক্তিযোদ্ধা কাজল মামার সাহসী
সৎগামের গল্প শুনে অন্তর ঘনে মামার মুখ থেকে যুদ্ধের গল্প শোনার আগ্রহ জাগে। সে মামার জন্য অধীর
আগ্রহে অপেক্ষা করে। এক সময় একুশে ফেরুক্ক্যারির দুঁদিন আগে কাজল মামা ঢাকায় আসেন। মামার
কাছেই শুরু হয় অন্তর অতীত সম্পর্কে তথ্যনির্ভর ইতিহাসের পাঠ। অন্ত জানতে পারে ঢাকা শহরের নামের
ইতিহাস, সাতমসজিদ রাস্তার নামের ইতিহাস। জানতে পারে যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের পার্থক্য। পঁচিশে মার্চের রাতে
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ ও ছাত্রদের প্রতিবাদী ভূমিকার কথা। ঢাকা শহরে রিকশায় ঘুরতে
ঘুরতে কিশোর অন্ত স্মৃতিসৌধ, মাতৃভাষা আন্দোলন, শহিদ মিনারসহ বাঙালি জাতির পিতৃপুরুষ কারা
সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

লেখক-পরিচিতি

কথা সাহিত্যিক হারুন হাবীব একজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা এবং ৭১ এর রণাঙ্গন সংবাদদাতা। তিনি মুক্তিযুদ্ধ
বিষয়ে প্রচুর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হলো: ‘প্রিয়যোদ্ধা’, ‘ছোটগল্প—
সমগ্র ১৯৭১’, ‘মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত প্রবন্ধ’, ‘Blood and Brutality’ ইত্যাদি। তাঁর জন্ম ১৯৪৮ সালে
জামালপুরে।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে আমাদের কী কী করা উচিত - ১০টি বাক্যে তা লেখ।
খ. তোমার গ্রাম/মহল্লার যেকোনো একজন মুক্তিযোদ্ধার সংক্ষিপ্ত জীবনী কমপক্ষে ১৫টি বাক্যে লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

১. মোগাল আমলে ঢাকার নাম ছিল
 ক. বাবরনগর খ. হুমায়ুননগর
 গ. আকবরনগর ঘ. জাহাঙ্গীরনগর
২. অন্তর নানা কাজলকে বকতেন কেন?
 ক. ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকায়
 খ. গ্রামে চলে যাওয়াতে
 গ. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে
 ঘ. ঢাকরি হয়নি বলে

নিচের উদ্দীপক পড়ে ঢ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (১) “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেরুয়ারি”
 (২) “মুক্তির মন্দির সোপান তলে
 কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রজলে।”
৩. উদ্দীপকের প্রথম অংশটি ‘পিতৃপুরুষের গল্প’ গল্পের কোন দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
 i. ভাষা আন্দোলন
 ii. মুক্তিযুদ্ধ
 iii. ইতিহাস-ঐতিহ্য

কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|--------|----|-------------|
| ক. | i | খ. | ii |
| গ. | i ও ii | ঘ. | i, ii ও iii |
৪. উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের মূলভাব নিচের কোন কথাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে?
 ক. স্বাধীনতা এবার আসবেই
 খ. যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাও
 গ. অনেক রক্তের ইতিহাস আছে
 ঘ. ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ

সূজনশীল প্রশ্ন

১. সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রিয়তি বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রথমবারের মতো ঢাকায় বেড়াতে এসেছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাবা-মা ওকে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। বাবা-মায়ের সাথে সেও ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। বাবার কাছে ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের কথা শুনে গর্বে মনটা ভরে ওঠে প্রিয়তির।
- ক. ১৯৭১ সালে কাজল মামা কোথায় পড়ত?
- খ. ‘যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাত’ – উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
- গ. অন্ত ও প্রিয়তির মনোভাব কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ – ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘‘উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি ‘পিতৃপুরুষের গল্প’ গল্পের সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না’’ – উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

ছবির রং হালেম খান



ছবি আকতে ইচ্ছে হচ্ছে ?

কাগজ তো সাদা । পেশিয়ে আঁকা থায় । হাজের কলমটা দিয়েও আঁকা থায় এই সাদা জগিমে ।

বং হলে খুউব ভালো হয় । ইচ্ছে যতো লাল, নীল, সবুজ, বেগুনি, হলুদ, কালো বং ঘৰে ঘৰে সাদা কাগজটা ভরে ফেলা থায় । সুস্মর এক রঙিন ছবি আঁকা হয়ে থায় ।

হলুদ, নীল ও লাল এই তিনটিই কিন্তু আসল বং । এই তিনি বং ধোকলে নানা রঞ্জে তরা পরিপূর্ণ রঙিন ছবি আঁকা থায় । এই তিনটি বং যিশিয়ে যিশিয়ে অনেক বং পাখরা থায় । বেমন —

হলুদ ও নীল মেশালে পাবে সবুজ ।

নীল ও লাল মেশালে পাবে বেগুনি ।

লাল ও হলুদ মেশালে পাবে কমলা ।

এভাবে একটির সঙ্গে আরেকটি বং বা একাধিক বং যিশিয়ে কত রকম বং যে পাখরা থায় তার মধ্যে কয়েকটি বং ছাড়া সবগুলো সঠিক নামে চেনা সজ্জব নয় । তাই সিকাত হয়েছে — লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটিই হলো মৌলিক বং বা প্রাথমিক বং । সবুজ, কমলা ও বেগুনি হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের বা মাধ্যমিক বং এবং অন্যান্য বং পরবর্তী পর্যায়ের । সাদা ও কালো বং ছবি আঁকার ক্ষেত্রে খুবই উক্তপূর্ণ । মৌলিক বং যিশিয়ে এই দুটো বং পাখরা থাবে না । তবে সবুজ ও লাল ঘন করে যিশিয়ে কালোর কাছাকাছি পাঢ় একটি বং তৈরি করা সম্ভব ।

রংধনুর সাতটি রং । বৃষ্টির পর আকাশে যখন রংধনু ফুটে ওঠে একটি একটি করে গুণে সাতটি রং খুঁজে বের করা যায় । হলুদ, কমলা, লাল, সবুজ, নীল, বেগুনি ও গোলাপি ।

বাংলাদেশ ষড়খন্তুর দেশ । বছরের ১২ মাসকে আমরা ২ মাস করে প্রকৃতি ও আবহাওয়ার কারণে ভাগ করে নিয়েছি ।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই ২ মাস গ্রীষ্মকাল । আবহাওয়া থাকে শুক্র ও গরম । বৃষ্টি হয় কম । গাছপালা, খাল-বিল-নদী শুকিয়ে যায় । প্রচণ্ড রোদে গাছের সবুজ-সতেজ রং বিবর্ণ হয়ে যায় । আবার হঠাতে করে আকাশে কালো রঙের মেঘের ছুটাছুটি, বিদ্যুৎ চমকানো, সঙ্গে কানে তালালাগা প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হয় । তারপর ঝড় ও বৃষ্টি । প্রকৃতিতে রঙের নানা রকম খেলা চলে । রং-বেরঙের ফল — আম, জাম, কলা, লিচু, তরমুজ এই গ্রীষ্ম ঋতুতে পাওয়া যায় । লাল, নীল, কালো, হলুদ, গোলাপি, কমলা সবুজ রঙের এই বাহারি ফলগুলোর স্বাদও মিষ্টি ।

বর্ষাকাল হলো আষাঢ়-শ্রাবণ মাস । বিরবিরে অল্প বৃষ্টি থেকে ঝর করে প্রবল বেগে বৃষ্টি হয় এ সময় । মাঠ-ঘাট-নদী নালা বিল-বিল পানিতে টইটুম্বুর । পানি পেয়ে গাছপালা সতেজ হয়ে যায় — নানা রকম সবুজ রঙে ভরে যায় গাছপালা, বন-জঙ্গল, ধানক্ষেত, পাটক্ষেত ইত্যাদি । সাদা ও কমলা রঙের কদম ফুল বর্ষা ঋতুর ফুল । এই ঋতুতে সতেজ ও সবুজ কচুবনে যখন কমলা রঙের লম্বা লম্বা ফুল ফোটে চমৎকার লাগে দেখতে । কচুফুল তরকারি হিসেবেও সুস্মাদু ।

শরৎকাল — সাদা ও স্বচ্ছ নীলের ছড়াছড়ি । ভাদ্র ও আশ্বিন — এই দুই মাস শরৎকাল । এ সময়ে বৃষ্টি বসে যায় । সুন্দর নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘ ভেসে বেড়ায় । গাছপালা নদীনালা প্রকৃতির সবকিছু এই ঋতুতে ঝকঝকে । নদীর ধারে ও বিলে অল্প পানিতে কাদা মাটিতে সবুজ গাছ থেকে বের হয়ে আসে নরম সাদা কাশফুল । বাতাসের দোলায় এই কাশফুল যখন দোলে, সুন্দর নরম রঙের কারণে মন তখন আনন্দে নেচে ওঠে । বিলে, পুকুরে এ সময় শাপলাফুল ফোটে । বেশির ভাগ শাপলা সাদা, লাল শাপলাও আছে — যা দেখতে খুবই সুন্দর । ভরা নদী ও খালে সাদা, লাল, নীল ও হলুদ বিভিন্ন রঙের পালতোলা নৌকা-চলাচলের দৃশ্য মোহনীয় ।

হেমন্ত ঋতু হলো কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস । সবুজ ধানক্ষেতের রং হলুদ হতে শুরু করে । ঋতুর শেষ দিকে — অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে পুরো মাঠে হলুদ বা গেরুয়া রঙের বাহার । ধান পেকে গিয়েছে । চাষিরা দল বেঁধে ফসল কাটা শুরু করে ।

এরপরেই পৌষ ও মাঘ মাস — শীতকাল । বনে জঙ্গলে, বাড়ির আঙিনায় সর্বত্রই নানা রঙের ফুল ফোটা শুরু হয় । এই ফুল ফোটা শীতের পরে বসন্ত ঋতু পর্যন্ত চলতে থাকে । শিমুল, পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া গাছে যখন ফুল ফোটে, হলদে গাছের বালমলে হলুদ রঙের ফুলে পুরো প্রকৃতি যেন রঙের উৎসবে মেতে ওঠে । মাঠে তিলের ক্ষেতে সাদা ও হালকা বেগুনি ফুল এবং সরষের ক্ষেতে ফুলে ফুলে হলুদের বন্যা নামে এই

শীতকালেই। শীতের কারণে মানুষের পোশাকে আসে রঙের বৈচিত্র্য। লাল, নীল, হলুদ, কালো বিচিত্র রঙের গরম কাপড় ও টুপি ব্যবহার করে মানুষ।

শীতকালে কুয়াশাও প্রকৃতিতে ধোঁয়াটে ধরনের এক মায়াবী রং আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। খুবই ঠাণ্ডা ও বরফ-পড়া দেশ থেকে চলে আসে আমাদের দেশে লক্ষ পাখি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে এরা আশ্রয় নেয় আমাদের দেশের খালে বিলে নদীতে — যাদের বলা হয় অতিথি পাখি। রং-বেরঙের পালক এসব পাখির। শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে এরা আবার চলে যায় নিজের দেশে।

ফাল্বন ও চৈত্র বসন্তকাল। ষড়খৰ্তুর শেষ ঝাতু। এ সময় গাছে গাছে যেন প্রতিযোগিতা — কে কত সুন্দর ও সতেজ ফুল ফোটাতে পারে। নানা রঙের পালকে সেজে ছেটবড় সব পাখি গাছে গাছে নেচে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায়। ফুলের মধ্য খেয়ে উড়ে বেড়ায় আনন্দে। অন্যদিকে হাজার লক্ষ রঙিন প্রজাপতি। এত রং-বেরঙের যে হিসেব করা সম্ভব নয়। নানা রঙের মোহময় প্রেরণায় মানুষও স্বভাবসূলভ আনন্দে মেঠে ওঠে। বাসন্তি ও উজ্জ্বল রঙের পোশাকে, সাজ সজ্জায় উৎসবে মেঠে ওঠে। তাই বসন্ত ঝাতুই হলো রঙের ঝাতু।

অনেক কাল আগে থেকেই — বাংলাদেশের ষড়খৰ্তুতে আমাদের পরিবেশে, নিসর্গে উজ্জ্বল-সুন্দর নানা রঙের যে সমাবেশ ঘটেছে — রূপের রকমফের ঘটে চলেছে — তা বাঙালির মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই আমরা দেখি আমাদের গ্রামীণ সমাজের লোকশিল্পীরা মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, কাপড় ও তুলার পুতুল, সোনার পুতুল, লক্ষ্মীসরা, শখের হাঁড়ি, নকশিকাথা, হাতপাথা, পাটি, গল্ল বলার পটে তথা লোকশিল্পে উজ্জ্বল ও সতেজ রং ব্যবহার করে ছবি ও শিল্পকে সুন্দর ও মোহনীয় রূপ দিয়ে চলেছে।

তাঁতে তৈরি কাপড়ে তাঁতিরা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের তৈরি তাঁতের পোশাকে রঙিন সুতোর বুনটে নানা রঙের বালমলে মনকাড়া সব শাড়ি ও পোশাক বানিয়ে চলেছে। আমাদের শিশুরা এখন ছবি আঁকে। বিভিন্ন দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিশুদের ছবির রং অনেক উজ্জ্বল, সাহসী এবং মৌলিক রং ঘেষা। তাই খুব সহজেই বাংলার শিশুদের ছবিকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে চেনা যায়।

চারংকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাণ চিরশিল্পীদের ছবির সামনে দাঁড়ালে একই কথা মনে হবে। বাংলাদেশের শিল্পীরা অনেক মুক্ত, সহজ ও সাহসী। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি, কমলা, কালো ও সাদা রংকে শিল্পীরা সুন্দরভাবে ছবিতে, নকশিকাথায়, হাতপাথায়, পুতুলে, হাঁড়িপাতিলে ব্যবহার করছেন। তাই বাংলার শিল্পীদের শিল্পকর্ম সারা বিশ্বে প্রশংসন পাচ্ছে।

শব্দার্থ ও টীকা

খুউব	-	খুব। জোর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে খুউব।
মৌলিক রং	-	যার মধ্যে অন্য কোনো রঙের মিশ্রণ ঘটে নি। একটি মাত্র রঙে গঠিত।
ষড়	-	ছয়।
প্রচণ্ড	-	কড়া, কঠোর।
গেৱহয়া	-	মেঠে।

- বাহার - শোভা, সৌন্দর্য।
 সর্বত্র - সব জায়গায়।

পাঠের উদ্দেশ্য

খাতুভেদে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করে তোলা।

পাঠ-পরিচিতি

আমরা চারপাশে গাছ-লতাপাতা, ফুল, মাঠ, নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি দেখি। তাদের রূপ আছে। রং আছে। সেই রূপকে নানান রঙে নিজের মতো যাঁরা আঁকেন তাঁদের আমরা বলি চিত্রশিল্পী। বিভিন্ন খাতুভেদে আমাদের চারপাশের পরিবেশের রূপ ও রং বদলে যায়। চিত্রশিল্পী তাও তাঁদের ছবিতে রঙে-রেখায় ফুটিয়ে তোলেন। ছবির সেই নানান রং ও রঙের বৈচিত্র্যের কথাই লেখক হাশেম খান তাঁর ‘ছবির রং’ লেখাটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

লেখক-পরিচিতি

শিল্পী হাশেম খান ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চিত্রকলা বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও ঢাকা নগর জাদুঘরের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ছবি আঁকার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চাও করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : ‘ছবি আঁকা ছবি লেখা’, ‘জয়নুল গল্প’, ‘গুলিবিন্দু ৭১’।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. প্রকৃতিনির্ভর ছড়া, কবিতা বা গল্প লিখে দেয়াল-পত্রিকা প্রকাশ (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত কাজ)।
- খ. প্রকৃতিনির্ভর ছবি এঁকে প্রদর্শনীর আয়োজন (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত কাজ)।
- গ. শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ছবি আঁকার মৌলিক রংগুলো কী ?
 - ক. হলুদ, সবুজ ও বেগুনি
 - খ. লাল, হলুদ ও কমলা
 - গ. লাল, নীল ও হলুদ
 - ঘ. হলুদ, নীল ও সবুজ
২. অঞ্চলে মাঠে গেরুয়া বাহার দেখে বোঝা যায়-
 - i. আকাশে রংধনু উঠেছে
 - ii. মাঠে ধান পেকেছে
 - iii. মানুষের পোশাকে বৈচিত্র্য এসেছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উভয় দাও :

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বোনের সাথে বেড়াতে যায় সবিতা। সেখানে তার বোন তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে দেখায়। হঠাৎ সবিতার চেখ ক্যাম্পাস সংলগ্ন বিলে আটকে যায়। সেখানে রংবেরঙের হাজার হাজার পাখির মেলা বসেছে। কিন্তু কোনো পাখিই তার পরিচিত নয়।

৩. উদ্দীপকের অচেনা পাখিগুলো ছবির রং রচনায় উল্লিখিত কোন ঝুরুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ?

- | | | | |
|----|----------|----|----------|
| ক. | বর্ষাকাল | খ. | শরৎকাল |
| গ. | শীতকাল | ঘ. | বসন্তকাল |

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত পাখিগুলোকে আমাদের দেশে কী বলে ?

- | | | | |
|----|--------------|----|---------------|
| ক. | মায়াবী পাখি | খ. | রংবেরঙের পাখি |
| গ. | বসন্তের পাখি | ঘ. | অতিথি পাখি |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. গত ডিসেম্বরে রিংকু তার মামার বাড়ি আলোকনিয়ায় বেড়াতে যায়। তার মা তাকে সেখানকার স্কুলে নিয়ে যান। স্কুল প্রাঙ্গনে নানা রঙের অনেক ফুল আর প্রজাপতি দেখে সে মুক্ষ হয়। সেখানে সে শিক্ষার্থীদের তৈরি উজ্জ্বল রঙের নানা ধরনের পুতুল, বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা ছবি দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে।

- | | |
|----|--|
| ক. | চাষীরা কোন মাসে দল বেঁধে ফসল কাটে? |
| খ. | ‘এ দেশের প্রকৃতি নানারূপে প্রতিফলন ঘটেছে।’ – বুঝিয়ে লেখ। |
| গ. | স্কুলের দৃশ্যে কোন ঝুরুর পরিচয় পাওয়া যায়? |
| ঘ. | ‘বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি পুতুল ও আঁকা ছবিগুলো যেন আমাদেরই প্রকৃতি।’ – ‘ছবির রং’ প্রবন্ধের আলোকে এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। |

ରୋକେଯା ସାଖାଓଯାତ ହୋସେନ

ସେଲିନା ହୋସେନ



ରୋକେଯା ୧୮୮୦ ମୁହଁନାଥ ପାତ୍ରଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନପତ୍ରର ପାଠ୍ୟରେ ପ୍ରାମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ତା'ର ପିତା ଜହିର ମୋହାମ୍ମଦ ଆବୁ ଆଶୀ ସାବେର ପ୍ରଭୃତ ଜ୍ଞାନପତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଛିଲେନ । ପାଠ୍ୟରେ ପ୍ରାମେ ତାଦେର ବାଢ଼ିଟି ଛିଲ ବିଶେଷ । ସାଡେ ତିନ ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଲ ତାଦେର ବାଢ଼ିଟି ।

ରୋକେଯା ସେ ସମୟେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ ସେ ସମୟେ ବାଙ୍ଗଲି ମୁସଲମାନ ସମାଜେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଳନ ଛିଲ ନା । ଫଳେ ମୁସଲମାନଙ୍କା ଶିକ୍ଷା-ଦୀକ୍ଷା, ଚାକରି, ସାମାଜିକ ଅଭିନାଶ ଦିକ ଥିଲେ ପିଛିଯେ ଛିଲ । ମେଘଦେର ଅବହ୍ଲାନ ଛିଲ ଖୁବଇ ଶୋଚନୀୟ । ପର୍ଦାପ୍ରଥା କଠୋରଭାବେ ମାନା ହଜେ ବଲେ ମେଘଦେର ଶିକ୍ଷା ଲାଭେର କୋନୋ ସୁଯୋଗ ଛିଲ ନା । କିନ୍ତୁ ମେଘଦୀ ରୋକେଯାର ପ୍ରବଳ ଆଶ୍ରମ ଛିଲ ସେଖାପଡ଼ାର ପ୍ରତି ।

ରୋକେଯାର ବଡ ଦୁଇ ଭାଇ କଲକାତାର ସେନ୍ଟ ଜେଭିଆର୍ସ କଲେଜେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେନ । ବୋଲଦେର ଆଶ୍ରମ ଦେଖେ ବଡ ଭାଇ ଇତ୍ତାହିମ ସାବେର ବୋଲ କରିଯିବେଳୋ ଓ ରୋକେଯାକେ ଇଂରେଜି ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତ କରେନ । କରିଯିବେଳୋର ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ ରୋକେଯା ବାଙ୍ଗା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଓ ଚର୍ଚା ଆଶ୍ରମ ହେଲେ ଓଠେନ । ରୋକେଯା ତା'ର ରଚିତ 'ମାତିଚର' ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ କରିଯିବେଳୋକେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେଛିଲେନ । ଉତ୍ସର୍ଗ-ପତ୍ର ତିନି ଲିଖେଛିଲେନ, 'ଆପାଜାନ! ଆସି ଶୈଶବେ ତୋମାରଇ ସେହେର ପ୍ରସାଦେ ବର୍ଣ୍ଣପରିଚୟ ପଡ଼ିଲେ ଶିଖି । ଅପର ଆଜୀଯଗତ ଆମାର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଓ କାରାସି ପଡ଼ାଯ ତତ ଆପଣି ନା କରିଲେଣ ବାଙ୍ଗାର ପଡ଼ାର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଛିଲେ । ଏକମାତ୍ର ତୁମିଇ ଆମାର ବାଙ୍ଗାର ପଡ଼ାର ଅନୁକୂଳେ ଛିଲେ ।' ନାନା ବାଧା ଏହିଯେ ରୋକେଯା ଆପଣ ସାଧନାର ବାଙ୍ଗା ଭାବାର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ । ତାଇ ରୋକେଯା ସାଖାଓଯାତ ହୋସେନ ଏକଜନ ଅସାଧାରଣ ନାରୀ ।

১৮৯৮ সালে কিশোরী বয়সেই বিহারের ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়। স্বামীর সহযোগিতায় তিনি তাঁর পড়াশোনার চর্চা চালিয়ে যান। বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯০২ সালে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘নবপ্রভা’ পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর প্রথম রচনা ‘পিপাসা’। বিভিন্ন সময়ে তাঁর রচনা নানা পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। ১৯০৫ সালে প্রথম ইংরেজি রচনা ‘সুলতানাজ ড্রিম’ মান্দ্রাজ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় ছাপা হয়। তাঁর রচনা সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

১৯০৯ সালে সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন মারা যান। রোকেয়া ভাগলপুরে তাঁর নামে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তখন স্কুলের ছাত্রী ছিল পাঁচ জন। ১৯১১ সালে এই স্কুলটি তিনি কলকাতায় স্থানান্তর করেন। শুরুতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল আট। আস্তে আস্তে স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা বাঢ়তে থাকে।

রোকেয়া বাঙালি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য শুধু স্কুলই প্রতিষ্ঠা করেন নি, ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের স্কুলে পাঠ্যনোর জন্য বাবা-মায়ের কাছে আবেদন-নিবেদন করেছেন। এই কাজে তিনি ছিলেন একজন নিরলস পরিশ্রমী কর্মী। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে নারীশিক্ষার অগ্রগতি সূচিত হয়। মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষার আলোর দিকে এগোতে থাকে।

১৯১৫ সালে তিনি ‘আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম’ নামে একটি মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে দুষ্ট নারীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হতো। তাদের হাতের কাজ শেখানো হতো, সামান্য লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। এক কথায় এই সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল সমাজের সাধারণ দুষ্ট নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলা।

রোকেয়ার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা পাঁচটি : ‘মতিচূর’ ১ম খণ্ড (১৯০৪), ‘সুলতানাজ ড্রিম’ (১৯০৮), ‘মতিচূর’ ২য় খণ্ড (১৯২২), ‘পদ্মরাগ’ (১৯২৪) ও ‘অবরোধবাসিনী’ (১৯৩১)।

রোকেয়া এই উপমহাদেশের একজন দ্বরূপ্তিসম্পন্ন মানুষ। নারীশিক্ষার অগ্রদৃত হিসেবে সমস্ত বাঙালি সমাজের তিনি শুরুকেয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তিনি দুইভাবে নারীদের মুক্তির পথ দেখেছিলেন। এক মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করে, দুই নিজের রচনায় নারী মুক্তির দিক নির্দেশনা দিয়ে।

তিনি ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রভৃতি	-	প্রচুর।
ভূসম্পত্তি	-	জমিজমা।
সামাজিক প্রতিষ্ঠা	-	সমাজে গৌরবময় অবস্থান। সমাজে গণ্যমান্য হওয়া।
শোচনীয়	-	খুব দুঃখজনক।
প্রবল	-	প্রচঙ্গ, তীব্র।
আগ্রহ	-	ইচ্ছা।
অনুপ্রেরণা	-	উৎসাহ, কোনো বিষয়ে কারও মধ্যে ইচ্ছা জাগানো।
খণ্ড	-	ভাগ, অংশ।

বৰ্ণপৰিচয়	- বাংলাভাষা শেখা শুরু কৰাৰ জন্য ইশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৱেৰ লেখা একটি বই ।
বাঙালা	- বাংলা । ‘বাংলা’ বোৰাতে বাঙালা শব্দটি একসময় ব্যবহাৰ কৰা হতো । ‘বাঙালা’ শব্দটিই ‘বাংলা’য় পৱিণত হয়েছে ।
অনুকূলে	- পক্ষে ।
নিৰলস	- যাৰ অলসতা বা কুঁড়েমি নেই ।
স্বাবলম্বী	- স্ব — নিজ । যে নিজেই নিজেৰ অবলম্বন ।
দূৰদৃষ্টিসম্পন্ন	- দূৰদৃষ্টি — দূৰকে দেখাৰ দৃষ্টি । এখানে দূৰ বলতে ভবিষ্যৎ কাল বোৰানো হয়েছে ।
বিংশ	- বিশ বা কুড়ি ।
অগ্রদূত	- পথপ্রদৰ্শক ।

পাঠেৰ উদ্দেশ্য

নারীৰ কৰ্মজগতেৰ প্রতি শ্ৰদ্ধাবোধ জাগ্রত কৰা ।

পাঠ-পৱিচিতি

রোকেয়া সাখা৓য়াত হোসেন বাংলাদেশেৰ নারী-আন্দোলনেৰ অগ্রদূত । বিশ শতকেৰ শুৰুৰ দিকে যখন এদেশেৰ নারীৱা শিক্ষা-দীক্ষা ও সকল অধিকাৰ থেকে বঞ্চিত ছিল তখন তিনি প্ৰায় একক চেষ্টায় মেয়েদেৰ শিক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন । তাঁৰ এই আন্দোলনেৰ হাতিয়াৰ ছিল কলম — লেখালেখি । একটি শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান পৱিবারেৰ সদস্য ছিলেন তিনি । কিষ্ট তাৰপৰও অনেক প্ৰতিকূলতাৰ ভিতৰ দিয়ে তাঁকে শিক্ষাগ্রহণ কৰতে হয়েছে । ফলে নারীশিক্ষার প্ৰতিবন্ধকতা সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন । এই পটভূমিতেই তিনি তাঁৰ লেখালেখিৰ জগৎকে যৌক্তিক ও শাণিত কৰে তোলেন । ফলে অনিবার্যভাৱেই নারীমুক্তিৰ আন্দোলনে তাঁৰ অবদান অত্যন্ত শুভৃত্পূৰ্ণ ।

লেখক-পৱিচিতি

বাংলাদেশেৰ বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও গল্পকাৰ সেলিনা হোসেন ১৯৪৭ খ্ৰিষ্টাব্দে রাজশাহীতে জন্মগ্ৰহণ কৰেন । তাঁৰ পৈতৃক নিবাস লক্ষ্মীপুৰ জেলা । সেলিনা হোসেনেৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হলো : ‘জলোচ্ছাস’, ‘হাঙৰ নদী ফ্ৰেনেড’, ‘মগ্ন চৈতন্যে শিস’, ‘পোকামাকড়েৰ ঘৰবসতি’, ‘মুক্তিযুদ্ধেৰ গল্প’ ইত্যাদি ।

কৰ্ম-অনুশীলন

- ক. শিক্ষার্থীৱা তাৰ দেখা একজন নারীৰ (মা, ৰোন, শিক্ষিকা প্ৰমুখ) কৰ্মজগৎ নিয়ে রচনা লিখবে (একক কাজ) ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত প্রথম স্কুলটি কতজন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে ?

- | | |
|---------|---------|
| ক. তিনি | খ. পাঁচ |
| গ. সাত | ঘ. নয় |

২. বেগম রোকেয়ার সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের অবস্থা ছিল —

- i. অনংসর
- ii. পশ্চাত্পদ
- iii. স্বাভাবিক

কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অঞ্চ বয়সে বিয়ে হয়ে যায় আমেনার। বাড়ির সবার আপত্তি সত্ত্বেও লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী আমেনাকে তার শ্বশুর স্কুলে ভর্তি করে দেন। শ্বশুরের সহযোগিতায় লেখাপড়া শেষ করে প্রতিষ্ঠিত হন আমেনা। এরপর গ্রামের অন্য মেয়েদেরকেও শিক্ষিত হয়ে কাজ করতে আগ্রহী করে তোলেন।

৩. আমেনার শ্বশুরের সঙ্গে ‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’ প্রবন্ধের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে?

- ক. ইব্রাহীম সাবেরের
- খ. জহির মোহাম্মদ আবু আলী সাবের
- গ. সাখাওয়াত হোসেন
- ঘ. করিমুল্লেসার

৪. বেগম রোকেয়া এবং আমেনার মূল লক্ষ্য ছিল, নারী সমাজের —

- i. স্বাবলম্বন
- ii. শিক্ষা
- iii. সাহিত্য রচনা

কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

শরীফা ও নীলা দুজনেই মানব সেবায় নিয়োজিত। শরীফা খুঁজে খুঁজে অসহায় মেয়েদের ক্ষেত্রে ভর্তি করিয়ে দেন। শত বাধা এলেও এ বিষয়ে তিনি আপোস করেন নি। অন্যদিকে নীলা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কয়েকটি সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সেখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে, রোগ, দুঃখ ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কাজ করেন।

- ক. বেগম রোকেয়া কার অনুপ্রেরণায় সাহিত্য রচনায় আঘাতী হয়ে ওঠেন ?
- খ. বেগম রোকেয়ার সময়ে নারীর অবস্থা কেমন ছিল? বুঝিয়ে লেখ ।
- গ. শরীফার কাজে বেগম রোকেয়ার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. মানব সেবার ক্ষেত্রে নীলা ও বেগম রোকেয়ার ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা কর ।

সেই ছেলেটি

মামুনুর রশীদ



১ম দ্রুত্য :

(গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছে সোমেন, সাবু ও আরজু। সবাই গান গাইতে গাইতে কুলে যাচ্ছে। বেশ তাড়া তাদের। একসময় হঠাতে খেমে যায় আরজু। ওরা আরজুকে ফেলেই চলে যায়। আরজুর ব্যথা পায়ে। সাবু ফিরে আসে।)

- | | | |
|----------------|---|---|
| সাবু | - | কী হলো আবার? |
| আরজু | - | আমি যে আর হাঁটতে পারছি না। |
| সাবু | - | রোজ রোজ তোর জন্য আমি স্যারের বকুনি খেতে পারব না। |
| আরজু | - | ঠিক আছে তোরা যা, আমি একাই এক্সুনি যাব। |
| সাবু | - | থাক তাহলে।
(চলে যায় সাবু। আরজু বসে পড়ে। এ সময়ই ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক আইসক্রিমওয়ালা।) |
| আইসক্রিমওয়ালা | - | আইসক্রিম, আইসক্রিম চাই আইসক্রিম। কী হলো আরজু মিয়া, তুমি এখানে বসে কী করছ? |
| আরজু | - | কিছু না। |
| আইসক্রিমওয়ালা | - | কুলে যাবে না? |
| আরজু | - | না। |

- আইসক্রিমওয়ালা**
- স্কুলে ফাঁকি দেওয়া কিন্তু খুব খারাপ, আমিও খুব স্কুল ফাঁকি দিতাম।
আমার অবস্থা দ্যাখো। যদি লেখাপড়াটা করতাম তাহলে কি আর আইসক্রিম ফেরি করতে হতো? যাও স্কুলে যাও। চাই আইসক্রিম, আইসক্রিম।
- আরজু**
- আইসক্রিমওয়ালা**
- ভাই শোনো— তুমি কোন দিকে যাচ্ছ?
 - আমি তো যাব ঐ বাজারের দিকে।
- আরজু**
- আইসক্রিমওয়ালা**
- আজ স্কুলের দিকে যাবে না? আইসক্রিম খাব, টিফিন পিরিয়ডের সময়
 - ক্লাস যখন চলে তখন তো আর আইসক্রিম বিক্রি হয় না। আমার বাজারের সময় চলে যায়। চাই আইসক্রিম। (আইসক্রিমওয়ালা চলে যায়। হাওয়াই মিঠাইওয়ালার প্রবেশ।)
- আরজু**
- হাওয়াই মিঠাইওয়ালা**
- ভাই শোনো।
 - শুধু শুধু ডাকছ কেন? এভাবে সময় নষ্ট হলে আমার হাওয়াই মিঠাই যে শূন্যে মিলিয়ে যাবে।
- আরজু**
- হাওয়াই মিঠাওয়ালা**
- তোমার হাওয়াই মিঠাই কি মেঘের মতো যে, মেঘ জমছে আর শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।
 - হ্যা, মেঘের চাইতেও অনেক হালকা — তাই তো মিলিয়ে যায়। যাই — চাই হাওয়াই মিঠাই (চলে যায়)।
- আরজু**
- এখন আমি কী করব? বাড়ি গেলে বাবা বলবে স্কুলে ফাঁকি দেওয়ার মতলব —
স্কুলে গেলে স্যার বলবে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।
এখন কী হবে?
- ২য় দৃশ্য :**

(টিফিনের ঘণ্টা বাজে। সোমেন, সাবু ও আরও ছেলে-মেয়েরা টিফিন পিরিয়ডে বেরিয়ে আসছে। তারা খেলছে। এ সময়ে আসেন শিক্ষক লতিফ স্যার।)

- লতিফ স্যার**
- এই সাবু, এদিকে শোনো — আচ্ছা আরজুকে দেখছি না যে?
- সাবু**
- স্যার মাঝপথে এসে আরজু বলল তোরা যা। এরকম মাঝে মাঝেই করে আরজু।
- লতিফ স্যার**
- কিন্তু কেন করে?
- সাবু**
- এমনিই।
- লতিফ স্যার**
- এমনিই মানে? ইচ্ছে করে? না কি কোনো সমস্যা আছে ওর?
- সাবু**
- জানি না স্যার।
- লতিফ স্যার**
- আচ্ছা। এই যে সোমেন, এদিকে শোনো, তোমার কী মনে হয় আরজু কি ইচ্ছে করেই স্কুল কামাই করছে?
- সোমেন**
- স্যার, ওর যে কী হয়? হঠাৎ করে বলে আমি আর যেতে পারছি না, তোরা দাঁড়া। তখন ওয়ার্নিংবেল বেজে গেছে। আর কি দাঁড়াতে পারি? তাই তো চলে আসি, সেটাই ভালো না স্যার?
- লতিফ স্যার**
- কোথায় যেন একটা সমস্যা মনে হচ্ছে।

- স্যার ঐ ছেলেটার সাথে আমারও দেখা হয়েছে।
- কোথায়?
- ঐ যে পলাশতলীর আমবাগানের ওখানে বসে আছে। আমার সাথে নানান কথা।
- নানা কথা? তাহলে স্কুলে এলো না কেন?
- একসময় বলল তুমি কি স্কুলের দিকে যাবে? আমি বললাম না — এখন বাজারে যাব। তারপর টিফিন পিরিয়ডের দিকে স্কুলের দিকে যাব।
- তাহলে তো খুবই চিন্তার কথা। আচ্ছা ঐ আমবাগানে কি এখনও আছে?
- মনে হয় এতক্ষণে বাড়ি চলে গেছে।
- তোমরা চলো তো —
- স্যার (ওদের চোখে মুখে অনিচ্ছা। হাওয়াই মিঠাইওয়ালা হেঁকে চলছে—হাওয়াই মিঠাই। লতিফ স্যার ওদের দুইজনকে নিয়েই রওয়ানা দেন।)

তৃয় দৃশ্য :

(আমবাগান। অসহায় আরজু বসে আছে। একা সে উঠে দাঁড়ায়। একটা পাখি ডাকছে। তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে সে।)

- আরজু
- পাখি, একটু নিচে নাম না। তোমার সাথে কথা কই। আমাকে স্কুলে নিয়ে যাবে? সাবু, সোমেন ওরা কেউ নিয়ে গেল না। তুমি নিয়ে যাও না! তোমার ডানায় ভর করে চলে যাব। কী হলো? নেমে গেলে কেন? মেঘ আমায় নিয়ে যাও না। তোমার কোলে বসে চলে যাব স্কুলে। কী বলছো? ভিজে যাব? ভিজলাম। আবার শুকিয়ে যাব — তবুও তো স্যার বুঝবেন, ছোট পাখি চন্দনা, এই যে শালিক আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? আমি একলা বসে আছি। আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। আমার সাথে কথা বল না — চন্দনা আমায় নিল না, মেঘ আমায় নিল না — শালিক আমার সাথে কথা বলে না।

(আরজু কাঁদতে থাকে। হঠাতে উপস্থিত হয় লতিফ স্যার।)

- লতিফ স্যার
- আরজু, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কী হয়েছে? তুমি স্কুলে যাও নি কেন?
- সোমেন
- কাঁদিস কেন? স্যারকে বল না। (আরজু কাঁদছেই)
- লতিফ স্যার
- কোনো ভয় নেই, বল।
- আরজু
- স্যার, আমি বেশি দূর হাঁটতে পারি না। পা দুটো অবশ হয়ে আসে।
- লতিফ স্যার
- তোমার বাবা-মাকে বল নি কেন?
- আরজু
- বলেছি — বাবা বলেন হাঁটা-হাঁটি করলেই ঠিক হয়ে যাবে।
- লতিফ স্যার
- তোমার পা দুটো দেখি — এ তো রোগ, তোমার পা চিকন হয়ে গেছে।
- আরজু
- মা জানে, সেই ছোটবেলায় কী যেন অসুখ হয়েছিল সেই থেকেই পাটা চিকন — মা বোঝে কিন্তু কাঁদে শুধু।
- লতিফ স্যার
- তোমরা খেয়াল কর নি?
- সোমেন
- না স্যার।

- লতিফ স্যার - তোমাদের বন্ধু না?
 সোমেন - জী স্যার।
 লতিফ স্যার - তোমার যদি এরকম হতো?
 সোমেন - আমরা বুঝতে পারি নি স্যার। এরকম বুঝলে আমরা দুজনে ধরে এইভাবে নিয়ে
 যেতাম। (দুজনেই কাঁধে হাত দিয়ে ওকে তুলে ফেলে।)
 লতিফ স্যার - বলো স্কুলে যাবে? না কি বাড়ি যাবে?
 আরজু - স্কুলে স্যার। (ওদের কাঁধে হাত তুলে আরজু স্কুলে যায়।)
 লতিফ স্যার - চলো। দেখি তোমার চিকিৎসার জন্য আমরা কী করতে পারি।

শব্দার্থ ও টীকা

- সেই ছেলেটি - ‘সেই ছেলেটি’ নামক এই লেখাটি একটি নাটক। এটি এ বইয়ের আর সব লেখার মতো
 নয়। এতে কয়েকজন বিশেষ বিশেষ জায়গায় থেকে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। এ
 ধরনের রচনা কেবল পড়ার জন্য নয়। এগুলো মধ্যে অভিনয় করে লোককে দেখানো হয়।
 এ ধরনের লেখা বড় পরিসরে থাকলে তাকে বলে নাটক।
- দৃশ্য - নাটক বা নাটকায় বিষয়গুলোকে ঘটনাস্থল অনুসারে ভাগ করে নেওয়া হয়। এক-একটি
 ঘটনাস্থলকে ‘দৃশ্য’ বলা হয়। ‘সেই ছেলেটি’ নাটকার তিনটি ঘটনাস্থলকে তিনটি দৃশ্যে
 ভাগ করে দেখানো হয়েছে। ১ম দৃশ্য — গ্রামের পাশের রাস্তা। ২য় দৃশ্য — সাবু,
 আরজুদের স্কুল। ৩য় দৃশ্য — আমবাগান।
- মতলব - উদ্দেশ্য বা ফন্দি।

পাঠের-উদ্দেশ্য

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবণ্ণিত) শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি।

পাঠ-পরিচিতি

নাট্যকার মামুনুর রশীদ রচিত ‘সেই ছেলেটি’ একটি নাটক। এ নাটকাটিতে একটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবণ্ণিত) শিশুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। একই সাথে প্রকাশ পেয়েছে শিশুর প্রতি বড়দের মমত্ববোধ। আরজু, সোমেন ও সাবু তিনি বন্ধু একই স্কুলে একই শ্রেণিতে
 পড়ে। কিন্তু বিদ্যালয়ে হেঁটে আসতে আরজুর খুব কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে তার পা অবশ হয়ে আসে।
 বন্ধুদের সাথে সমান তালে চলতে পারে না। কখনো কখনো বসে পড়ে। বন্ধুরা আরজুর জন্যে আস্তে
 আস্তে হাঁটে। তাতে স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যায় এবং ওরা শিক্ষকের কাছে বকুনি খায়। আসলে হয়েছিল
 কি, আরজু ছোটবেলায় ভীষণ অসুখে পড়েছিল। তাতে তার পা সরু হয়ে যায়। কিন্তু আরজু জানে না
 কেন তার পা অবশ হয়ে আসে। তার মা জানেন আরজুর অসুখের কথা। তিনি কাঁদেন।

একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে পা অবশ হয়ে গেলে, আরজু বন্ধুদের স্কুলে চলে যেতে বলে। সে রাস্তার
 পাশে বসে থাকে। আইসক্রিমওয়ালা আসে, হাওয়াই মিঠাইওয়ালা আসে। সে তাদের সাথে কথা বলে।
 তারা চলে যায়। আরজু ভাবে পাখি কিংবা মেঘ তাকে যদি উড়িয়ে নিয়ে স্কুলে দিয়ে যেত।

এদিকে শিক্ষক লতিফ স্যার আরজুকে ক্লাসে না দেখে সোমেনদের কাছ থেকে ঘটনাটি জেনে সোমেনদের সঙ্গে নিয়ে আরজুর খৌজে রওয়ানা হন। আরজুকে দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে আরজুর পা অবশ্য হয়ে আসা একটা রোগ। তখন লতিফ স্যারের কথায় সোমেনদের মনে সহানুভূতি জাগে। তাদের সহায়তায় আরজু ক্লাসে যায়।

লেখক-পরিচিতি

মায়মুনুর রশীদ বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক। তিনি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক হলো : ‘ওরা কদম আলী’, ‘ওরা আছে বলেই’, ‘ইবলিশ’, ‘গিনিপিগ’, ইত্যাদি।

কর্ম-অনুশীলন

১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার তৈরি করে র্যালির আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।
২. নাটকিটি অভিনয় করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সেই ছেলেটি নাটকায় দৃশ্য সংখ্যা কয়টি?

ক. দুইটি	খ. তিনটি
গ. চারটি	ঘ. পাঁচটি
২. আরজু তার বন্ধুদের সাথে ক্লাসে যেতে যেতে বসে পড়ে কেন?

ক. সে ক্লাসে যেতে চায় না	খ. স্যার তাকে বকুনি দিতে পারে
গ. তাঁর ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল	ঘ. রোগের কারণে সে হাঁটতে পারে না
৩. ‘মা বোঝে কিন্তু কাঁদে’ কারণ -

ক. ছেলের পা চিকন হয়ে যাচ্ছে	খ. ছেলের পা একদিন পঙ্ক হয়ে যেতে পারে
গ. ছেলের পায়ের কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না	ঘ. ছেলের এই অবস্থায় তিনি অসহায়

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রেবেকা কাছের জিনিস দেখতে পায় কিন্তু - দূরের জিনিস বাপসা দেখে। একদিন সে লক্ষ করল দূরের বাপসা জিনিস অর্ধেক দেখা যাচ্ছে আর অর্ধেক পুরো অন্ধকার। মাকে জানালে তিনি বললেন চোখে পানি দিলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। বরং অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে।

৪. রেবেকা কোন ধরনের শিশু?

- | | | | |
|----|--------------|----|----------|
| ক. | স্বাভাবিক | খ. | পৃষ্ঠিইন |
| গ. | সুবিধাবণ্ডিত | ঘ. | বুদ্ধিইন |

৫. সেই ছেলেটি নাটিকা অনুযায়ী রেবেকার প্রয়োজন-

- i. মাতা পিতার সহানুভূতি
- ii. সমাজের সহানুভূতি
- iii. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ধারণা

কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|---------|----|----------|
| ক. | i | খ. | i ও ii |
| গ. | i ও iii | ঘ. | ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. আবিদ স্যার ৭ম শ্রেণির ছাত্র রাওশনের কাছে তার স্কুলে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে সে কিছু না বলে চুপ থাকে। শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করলে তারা প্রায় একযোগে বলে — স্যার, রাওশন প্রায়ই স্কুল কামাই করে। শিক্ষক রাওশনকে বলেন-আর কামাই করবে? কোনো উত্তর দেয় না রাওশন। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে মেঝে খুঁড়তে থাকে। উত্তর না পেয়ে শিক্ষক রাওশনকে অনেক বকা দেন। কয়েকদিন পর রাওশনের বাবা আবিদ স্যারকে বলেন- স্যার, রাওশনের স্নায় রোগ আছে। নিয়মিত স্কুল করলে ওর অসুখটা বেড়ে যায়। বকাবকা করলে ওর স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যাবে।

- ক. মির্ঝ আরজুকে কোথায় বসে থাকতে দেখেছে?
- খ. আইসক্রিমওয়ালা আরজুকে স্কুল ফাঁকি দিতে নিষেধ করল কেন? বুবিয়ে জেখ।
- গ. রাওশন ও আরজুর মধ্যকার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. আবিদ স্যারের বিচার কাজটি লতিফ স্যারের তুলনায় কতটুকু যৌক্তিক হয়েছে তা মূল্যায়ন কর।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসম্মতি

এ. কে. শেরাম

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এই বাংলাদেশ বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির একটি দেশ। এখানে প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালির পাশাপাশি রয়েছে প্রায় অর্ধশত ক্ষুদ্র জাতিসম্মতি। তেমনি দেশের প্রধান ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার পাশাপাশি রয়েছে অনেক ভাষা এবং ঐসব জাতিগোষ্ঠীর নানা বর্ণের বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতিও। তারপরও আমরা সবাই জাতীয়তার পরিচয়ে এক এবং দেশকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ। বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই যে একতার শক্তি এটিই আমাদের বাংলাদেশকে সুন্দর ও বর্ণময় করে তুলেছে।

বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসম্মতির সংখ্যা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে সাধারণভাবে এই সংখ্যা ৪৬টি বলে অনুমিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের বিভিন্ন পাহাড়ি জনপদ ছাড়াও দেশের সমতলভূমি যেমন কক্সবাজার, পটুয়াখালি, বরগুনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টঙ্গাইল, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর ও সিলেট অঞ্চলে প্রখ্যাত এদের বসতি। এইসব জনগোষ্ঠী শত শত বৎসর ধরে এই ভূখণ্ডে বসবাস করছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকেই রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর কাছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি খুবই প্রিয়।

বাংলাদেশে যেসব সংখ্যাসম্মত জাতিসম্মতির বাস তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল, মণিপুরি, খাসি, শ্রে, রাখাইন, হাজং, তথ্যঙ্গা, বম, কোচ, পাহাড়িয়া, রাজবংশী, মালো, ওরাঁও ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

চাকমা

মঙ্গেলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত চাকমাদের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়। নিজেদের মধ্যে তারা ‘চাঙমা’ নামে পরিচিত। তারা আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিজস্ব হরফও আছে। চাকমারা পিতৃতাত্ত্বিক। পিতাই পরিবারের প্রধান। চাকমা সমাজের প্রধান হলেন রাজা। গ্রামের প্রধান হলেন কারবারি। গ্রামের যাবতীয় সমস্যা তিনিই নিষ্পত্তি করেন। চাকমারা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে তার পাশাপাশি এখনও তারা কিছু কিছু প্রকৃতিপূজাও করে থাকে। চাকমা পুরুষেরা ‘ধূতি’ ও মহিলারা ‘পিনন’ পরিধান করে থাকে। পুরুষেরা নিজেদের তাঁতে তৈরি ‘সিলুম’ (জামা) পরে। মেয়েরা ‘খাদি’কে ওড়না হিসেবে ব্যবহার করে।

চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস ও শাক-সবজি। চাকমা জীবনের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন লৌকিক আচার অনুষ্ঠান থাকে। বিয়ের সময় ছেলের অভিভাবককে ঘটকসহ কনের বাড়িতে কমপক্ষে তিনবার যাওয়া-আসা করতে হয়। প্রতিবার চুয়ানি, পান-সুপারি ও পিঠা নিয়ে যেতে হয়। বিজু উৎসব চাকমাদের একটি প্রধান উৎসব। চৈত্রের শেষ দুইদিন ‘ফুলবিজু’ ও ‘মূলবিজু’ এবং পহেলা বৈশাখকে ‘গর্যাপর্যা’ বলে আখ্যায়িত করে থাকে তারা। লোকনৃত্যগীত হিসেবে ‘জুমনাচ’ ও ‘বিজুনাচ’ বেশ জনপ্রিয়।

গারো

গারো জনগোষ্ঠীর প্রধান বসতি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও সিলেট অঞ্চলে। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত গারোরা মাতৃসূত্রীয়। যেয়েরা পরিবারের সম্পত্তির মালিক হয়। বিবাহের পর বর স্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে বসবাস করে থাকে। সন্তান-সন্ততিরা মায়ের পদবি ধারণ করে। তবে পরিবার, সমাজ পরিচালনা ও শাসনে পুরুষেরই দায়িত্ব পালন করে থাকে। একই গোত্রে বিবাহ গারো সমাজে নিষিদ্ধ। গারোদের নিজস্ব ধর্ম আছে। এটি এক ধরনের প্রকৃতি পূজা। গারোরা প্রধানত কৃষিজীবী। পাহাড়ে বসবাসকারীরা জুম চাষ করে। আর সমতলভূমির গারোরা নারী ও পুরুষ একসাথে সাধারণ নিয়মে কৃষিকাজ করে। গারোরা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবনের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। অলঙ্কারও ব্যবহার করে থাকে। গারো সংকৃতিতে গীতবাদ্য ও নৃত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের নিজস্ব কিছু বাদ্যযন্ত্রও আছে। ফসল বোনা, নবান্ন, নববর্ষ ইত্যাদি উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন হয়। ‘ওয়ানগালা’ গারোদের একটি জনপ্রিয় উৎসব।

মারমা

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত মারমাদের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে। মারমা ভাষাও মঙ্গোলীয় ভাষা পরিবারের। তাদের নিজস্ব বর্ণমালাও আছে। মারমারা প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা বিয়ের সময় ধর্মীয় ও লোকাচার মিলিয়ে নানা অনুষ্ঠান পালন করে। নিজেদের গোত্রে বিবাহকে মারমা সমাজে উৎসাহিত করা হয়। মারমারা পিতৃতাত্ত্বিক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ছেলে ও যেয়েদের সমান অধিকারের কথা বলা আছে। তবে পরিবার ও সমাজজীবনে পুরুষেরই প্রাধান্য থাকে। বিয়ের পর নারী-পুরুষ ইচ্ছে করলে মা-বাবার বাড়ি কিংবা শুশুরবাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। মারমাদের সামাজিক শাসনব্যবস্থায় রাজা প্রধান। মারমারা জুম চাষ করে এবং বনজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও মারমারা এখনও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা এবং নানা আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করে। তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো নববর্ষে সাংগ্রাহ দেবীর পূজা এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত সাংগ্রাহ উৎসব তিন দিন ধরে চলে।

মণিপুরি

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মণিপুরি জাতি অন্যতম। এদের আদি নিবাস ভারতের মণিপুর রাজ্য। এদের মধ্যে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের নিজস্ব বর্ণমালাও আছে। মণিপুরিরা যেখানেই বসতি স্থাপন করে সেখানে কয়েকটি পরিবার মিলে গড়ে তোলে পাড়া। প্রতিটি পাড়াতেই থাকে দেবমন্দির ও মণ্ডপ। ঐ মন্দির ও

মঙ্গলকে ঘিরেই আবর্তিত হয় ঐ পাড়ার বাবজীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ড। মণিপুরি সমাজে পাড়া বা আয় ও ‘গানচার’ বা পঞ্চাঙ্গেতের কৃষিকা খুবই উল্লেখ্য।



চিত্র : নৃত্যরত মণিপুরি

মণিপুরি জনগোষ্ঠী সাতটি গোত্রে বিভক্ত। মণিপুরিদের প্রাচীন ধর্মের নাম ‘আপোকপা’। তবে মণিপুরিদের অধিকাংশই এখন সন্মান ধর্মের তৈত্ন্যমতের অনুসারী। মণিপুরিদের একটি উৎসবমৌগ্য অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। সন্মান ধর্মাবলম্বী মণিপুরিদের প্রধান উৎসব রাস উৎসব, রথমাত্রা ইত্যাদি। রাস উৎসব উপলক্ষে রাসলৃক্ষ্য ও মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মণিপুরিরা প্রধানত কৃষিজীবী। ভাত, মাছ, শাক-সবজি মণিপুরিদের প্রধান খাদ্য। মণিপুরি পুরুষেরা সাধারণত খুতি, গায়ছা, জামা ইত্যাদি পরিধান করে। আর যেরেও পরে নিজেদের তৈরি বিশেষ ধরনের পোশাক।

তিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, রামগড়, রাজামাটি, কাঞ্চাই এবং চট্টগ্রাম জেলা, বৃহস্পতি কুমিল্লা, নোয়াখালি ও সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী তিপুরা জনগোষ্ঠী মহাজাতির অংশ। তাদের ভাষার নাম ‘কক্ষবরক’। এদের নিজের কোনো বর্ণবাচা নেই। তিপুরা সমাজব্যবহাৰ শিক্ষাত্ত্বিক। ছেলেরাই সম্পত্তিৰ উজ্জ্বলিকারী হয়। তিপুরারা বৰ্তমানে সাধারণভাবে সন্মান হিস্তু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু তারা এখনও তাদের প্রাচীন লোকজ ধর্মের নানা দেব-দেবীৰ পূজা অচলা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি করে।

তিপুরা যেরেও কাপড় বসনে খুবই দক্ষ। তারা নিজেদের পরানের কাপড় নিজেরাই তৈরি করে। পুরুষেরা পরিধান করে নিজেদের তৈরি গায়ছা ও খুতি। তিপুরারা কৃষিজীবী। তারা পাহাড়ে জুম চাষ করে। তিপুরাদের সংগীত ও নৃত্য খুবই সমৃদ্ধ। তাদের মধ্যে বিভিন্ন সংগীতের প্রচলন দেখন আছে, তেমনি আছে নানা

ধর্মাদেশের নৃত্যও। পিপুলাদেশের ধর্মান উৎসব নববর্ষ বা বৈসুখ। পিপুল জনপোষীর 'বৈসুখ', আরম্ভাদের 'সাহুর' ও চাকমাদের 'বিছু' উৎসবের প্রথম অক্ষর নিয়ে 'বৈসাখি' উৎসব এখন নববর্ষ উপলক্ষে পার্বত্য মহাদেশের জাতীয় উৎসব।

সৌওতাল

সৌওতাল জনপোষীর লোক ধর্মান উৎসবজ ও শিল্পেটের চা বাণানে বসবাস করে। ভাসের অর্থাৎ অট্টিক পরিবারের। সৌওতাল সমাজ পিতৃতাত্ত্বিক। সম্পত্তির মালিকানার ধরণ সমাজ ও পরিবারে পুরুষই ধর্মান। সৌওতালদের নিজের ধর্ম আছে। কিন্তু কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। পেশার দিক থেকে সৌওতাল জনপোষী ধর্মান দুই ভাগে বিভক্ত — কৃষক ও শিল্পিক। অনেকের জন্যে কৃষি বেশন ধর্মান জীবিকা তেমনি অনেকে আবার শিল্পিক হিসেবে বিভিন্ন জাতগার কাজ করে থাকে। ত্রিটিশ-বিজোৱা বাধীনতা আন্দোলনে সৌওতালদের সঞ্চার্যী জীবিকা বিশেষ করে 'সৌওতাল বিজ্ঞাহ' ও 'নাচোল কৃষক বিজ্ঞাহ' ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।



চিত্র : সৌওতাল নৃত্য

সৌওতালোর কুবই পরিকার-পরিচ্ছন্ন থাকে। বাড়িসর দেশে মুছে পরিকার জাখা হয় এবং দেশালে নালা বঁড় নিয়ে ঘুবি আৰু হয়। 'সোহুর' হচ্ছে সৌওতাল সমাজের প্রের্ণাত উৎসব। অটো অনেকটা পৌর-গার্বসের মতো। সৌওতাল নৃত্যে ঘেৰে-পুরুষ দলবদ্ধ হয়ে নাচে। ভাসের কুসুম নাচ কুবই জনপ্রিয়।

বাংলাদেশের এইসব কৃষি নৃত্যাত্ত্বিক জাতিসভার জীবন ও সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে— বর্ষিত ও বৈত্তিয়পূর্ণ করেছে। দেশের সামাজিক উন্নয়নের রয়েছে ভাসের বিহারি অবদান। কারা আজ জাতীয় মূল্যায়ারই অংশ।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

- ঙ্গুদ্র জাতিসভা** — বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ হচ্ছে বাঙালি। বাঙালি ছাড়া আরও কিছু ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠী বা জাতি আছে, যারা ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির দিক থেকে বাঙালিদের মতো নয়। এ সকল জাতিসভার এক-একটিকে বলা হয়েছে ঙ্গুদ্র জাতিসভা। যেমন : চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, হাজং, ত্রিপুরা ইত্যাদি।
- সংস্কৃতি** — ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয় পাওয়া যায় এমন সব বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় সংস্কৃতি। বাঙালির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলোর দ্বারা বাঙালিকে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে আলাদা করা যায়। তেমনি ঙ্গুদ্র জাতিসমূহের সংস্কৃতিও আলাদা আলাদা। তবে নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাংলাদেশের সকলেই এক ও অভিন্ন।
- আর্যভাষ্য** — ইউরোপে প্রথম উজ্জ্বল ঘটেছে এমন একটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী। তার একটি শাখার নাম আর্য ভাষা। এই আর্য ভাষা থেকে বাংলা, হিন্দি ওড়িয়া, চাকমা প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।
- পিতৃতাত্ত্বিক**
- পরিবার** — মানব সমাজে দুর্বকমের পরিবার প্রথার সৃষ্টি হয়েছে; (ক) পিতৃতাত্ত্বিক, (খ) মাতৃতাত্ত্বিক। পরিবারের প্রধান নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সম্পত্তি যদি পুরুষের হাতে থাকে তাহলে সে রকমের পরিবারকে বলা হয় পিতৃতাত্ত্বিক পরিবার। আর যে পরিবার প্রথায় উজ্জ্বল নেতৃত্ব ও ক্ষমতা নারীর হাতে থাকে, তাকে বলা হয় মাতৃতাত্ত্বিক। বাঙালিদের মতো চাকমাদের পরিবার পিতৃতাত্ত্বিক। তবে একালে মাতৃতাত্ত্বিক পরিবারেও পিতৃতাত্ত্বিক পরিবারের প্রভাব পড়েছে।
- খাদি** — হাতে কাটা (মেশিনে নয়) সুতা দিয়ে তৈরি কাপড়।
- লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান** — স্থান ও জাতি বিশেষের ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান যার মধ্যে বর্তমান নাগরিক রূচির প্রভাব পড়ে নি, তাকে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান বলা হয়।
- মাতৃসূত্রীয় পরিবার** — কিছু সমাজ আছে যেখানে পুরুষগণ সমাজ পরিচালনা ও শাসনের অধিকারী হলেও নারীদের পরিচয়েই পরিবার পরিচিত হয়। এ ধরনের পরিবারকে মাতৃসূত্রীয় পরিবার বলে। যেমন : গারো পরিবার।
- পদবি** — উপাধি, যা নামের শেষে যোগ করে বৎশ পরিচয় দেওয়া হয়। পদবি বলতে কর্মক্ষেত্রে স্তর বা মর্যাদাও বোঝায়।
- জুম** — পাহাড়ে চাষাবাদের বিশেষ পদ্ধতি।
- মঙ্গেলীয় ভাষাগোষ্ঠী** — একটি ভাষাগোষ্ঠী; এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রতিটি ভাষার আলাদা রূপ ও বৈশিষ্ট্য আছে।
- মণ্ডপ** — পূজা বা সভা-সমিতির জন্য ছাদযুক্ত চতুর।

বয়ন — বোনা।

পাঠের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলাদেশে মূল জনগোষ্ঠী হচ্ছে বাঙালি জাতি। বাঙালি ছাড়াও এদেশে আরও অনেক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। ক্ষুদ্র এই জাতিসম্পত্তির মধ্যে আছে চাকমা, গারো, মারমা, মণিপুরি, ত্রিপুরা, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠী।

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকটিরই রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়, নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনচার। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। চাকমা, গারো, মারমা, মণিপুরি, ত্রিপুরা ও সাঁওতালদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এই আলোচনা বৃহত্তর জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে সহায় হবে বলে ধারণা করা যায়।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনচার আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে, করেছে বৈচিত্র্যময় ও বর্ণিল। দেশের সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

লেখক পরিচিতি

বাংলাদেশে মণিপুরি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ কবি ও প্রাবন্ধিক এ. কে. শেরাম। তাঁর জন্ম ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে হবিগঞ্জে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : ‘বসন্ত কুন্তি পালগী লৈরাই’, ‘মণিপুরি কবিতা’, ‘চৈতন্যে অধিবাস’, ‘মনিদীপ্তি মণিপুরি ও বিম্বপ্রিয়া বিতর্ক’ ইত্যাদি।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার এলাকার বিভিন্ন লোকজ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচয় দিয়ে একটি রচনা লেখ (একক কাজ)

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর উৎসব কোনটি?

- | | | | |
|----|--------|----|--------|
| ক. | সাংগীত | খ. | বিজু |
| গ. | বৈসুখ | ঘ. | সোহরাই |

২. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসম্পত্তির জাতীয় মূলধারারই অংশ কারণ, তারা-

- i. আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে
- ii. জাতীয় সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে
- iii. ধর্মীয় দিক থেকেও তারা গুরুত্বপূর্ণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii
গ. iii ও i

- খ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাবার চাকরির সুবাদে সুমি সিলেটের একটি স্কুলে ভর্তি হয়। সেখানে লুসি দাড়িং নামে একটি মেয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। কথা প্রসঙ্গে সুমি জানতে পারে ‘দাড়িং’ লুসির মায়ের পদবি। শুনে তার কাছে আত্মত লাগে যে বিয়ের পর লুসির বাড়িতেই তার বর চলে আসবে।

৩. উদ্দীপকে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রজাতিসভা রচনার কোন জাতিসভার পরিচয় পাওয়া যায় ?

- ক. চাকমা
গ. গারো

- খ. মারমা
ঘ. সাঁওতাল

৪. উদ্দীপকের জাতিসভা আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, তারা আমাদের-

- i. সংস্কৃতির ধারক
ii. অবিচ্ছেদ্য অংশ
iii. ঐতিহ্যকে ধারণ করেছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii
গ. ii ও iii

- খ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১। বাহার তার বন্ধু সঞ্জীবের সাথে একটি পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে সে জানতে পারে স্থানীয় লোকজন সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, পিতৃতান্ত্রিক। তারা দেব-দেবীর পূজা করে এবং নববর্ষ এলে সাংগ্রাহ উৎসব পালন করে। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর তারা অন্যত্র বেড়াতে যায়। সেখানকার সমাজের প্রধান হলেন রাজা। গ্রামের প্রধান হলেন কারবারি। সেখানে পুরুষেরা ধুতি ও মহিলারা ‘পিনন’ পরিধান করে থাকে। পুরুষেরা নিজেদের তৈরি ‘সিলুম’ পরে। মেয়েরা খাদিকে ওড়না হিসেবে ব্যবহার করে।

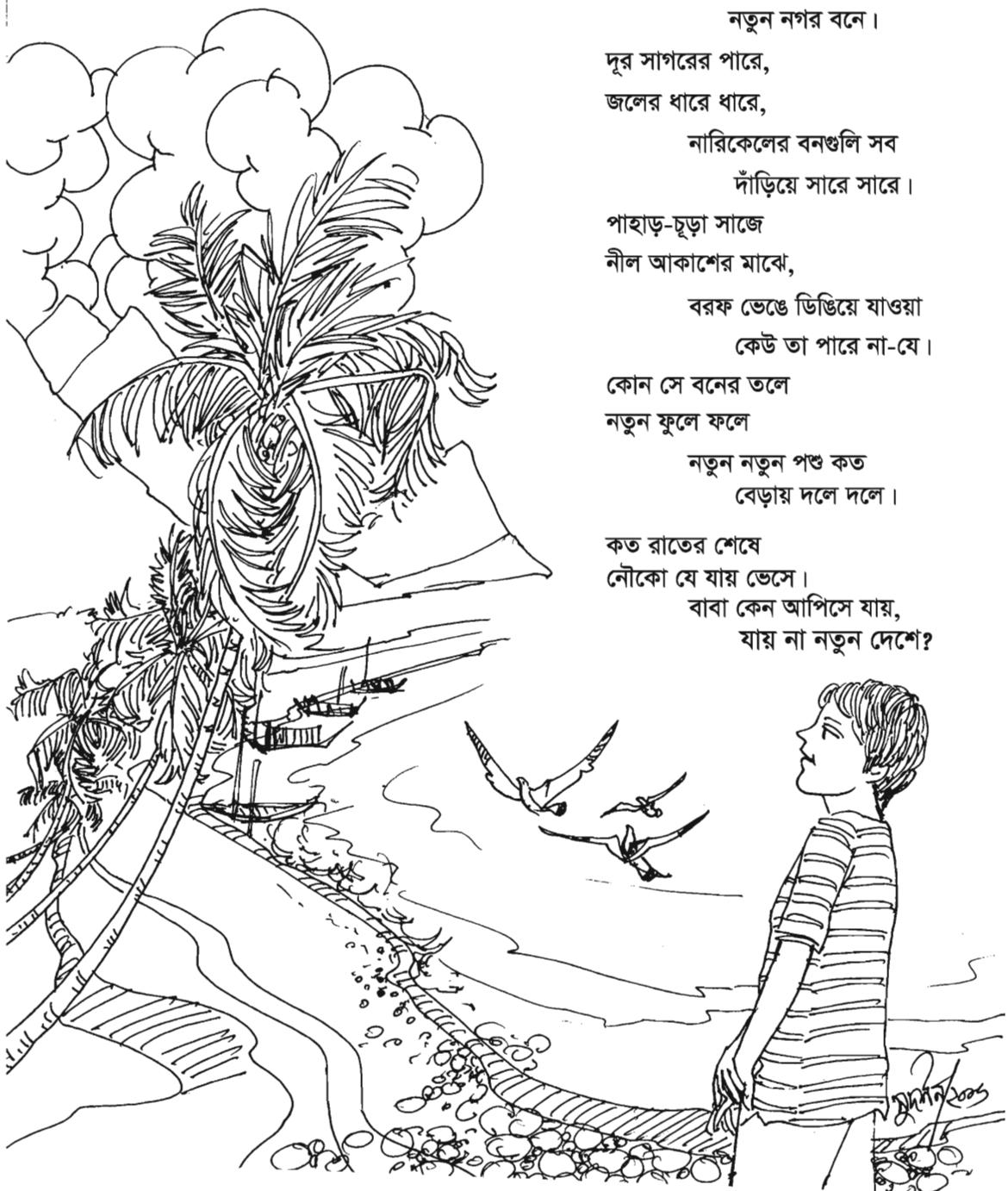
- ক. চাকমারা পহেলা বৈশাখকে কী বলে আখ্যায়িত করে?
খ. পঞ্চায়েতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ — কেন?
গ. উদ্দীপকের প্রথম স্থানটি ‘বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসভা’ রচনার কোন জাতিসভাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. শেষ স্থানটি বাংলাদেশের একটি স্কুল জাতিসভার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। উদ্দীপক ও রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

নতুন দেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নদীর ঘাটের কাছে
নৌকো বাঁধা আছে,
নাইতে যখন যাই, দেখি সে
জলের চেউয়ে নাচে।
আজ গিয়ে সেইখানে
দেখি দূরের পানে
মাঝনদীতে নৌকো, কোথায়
চলে ভাঁটার টানে।
জানি না কোন দেশে
পৌছে যাবে শেষে,
সেখানেতে কেমন মানুষ
থাকে কেমন বেশে।





থাকি ঘরের কোণে,
 সাধ জাগে মোর মনে,
 অমনি করে যাই ভেসে, ভাই,
 নতুন নগর বনে।
 দূর সাগরের পারে,
 জলের ধারে ধারে,
 নারিকেলের বনগুলি সব
 দাঁড়িয়ে সারে সারে।
 পাহাড়-চূড়া সাজে
 নীল আকাশের মাঝে,
 বরফ ভেঙে ডিঙিয়ে যাওয়া
 কেউ তা পারে না-যে।
 কোন সে বনের তলে
 নতুন ফুলে ফলে
 নতুন নতুন পশু কত
 বেড়ায় দলে দলে।
 কত রাতের শেষে
 নৌকো যে যায় ভেসে।
 বাবা কেন আপিসে যায়,
 যায় না নতুন দেশে?

শব্দার্থ ও টীকা

- ভাঁটা — চাঁদ ও সূর্যের শক্তির আকর্ষণে সমৃদ্ধ বা নদীতে বেড়ে উঠা জলের কমে যাওয়াকে বলা হয় ভাঁটা।
- আপিস — অফিস শব্দের একটি কথ্য রূপ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা জাগুত করা।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সহজ পাঠ’ গ্রন্থের প্রথম ভাগ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ কবিতায় অজানাকে জানার সীমাহীন কৌতুহল এবং প্রকৃতির সকল রহস্য উন্মোচন করার অপার আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশিত হয়েছে। ভাঁটার টানে ঘাটে বাঁধা নৌকা মাঝ নদী পেরিয়ে কোথায় গিয়ে যে পৌছবে তার কোনো ঠিক নেই। হয়তো কোনো নতুন দেশে বা নতুন পরিবেশে গিয়ে সে পৌছবে। এ সব প্রশ্নের উত্তর জানতে কৌতুহল জাগবে যে কারোরই। হয়তো কোনো অসীম সৌন্দর্য বা অজানা আনন্দ বা অপার বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। অজানার প্রতি এই ব্যকুলতা শিশুরা তার আশপাশের সবার মধ্যেও দেখতে চায়।

কবি-পরিচিতি

এশীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয় নি। সতেরো বছর বয়সে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। সে-পড়া শেষ না হতেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু স্বশিক্ষা ও সাধনায় একক অবদানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছেন যে যার কোনো তুলনা নেই। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত সাহিত্যের সকল শাখা তাঁর আশ্চর্য অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ ও চিত্রকলাতেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

অনন্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক ও অভিনেতা। শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি দেশপ্রেমমূলক গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। রবীন্দ্রনাথের সেখা গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। ছোটদের জন্য সেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে ‘কৈশোরক’ নামে একটি গ্রন্থে।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. তোমার কল্পনার দেশের একটি বর্ণনা প্রস্তুত কর।
 খ. তোমার এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দাও।
 গ. সর্বশেষ ভূমি যে অঞ্চলে ভ্রমণ করেছ তার বর্ণনা লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জলের ধারে কী দাঁড়িয়ে আছে ?
 ক. নতুন নগর খ. পাহাড় চূড়া
 গ. নারকেল বন ঘ. নতুন পশ্চ
 ২. “অমনি করে যাই ভেসে, ভাই / নতুন নগর বনে।”
 -এখানে কী প্রকাশ পেয়েছে ?
 i. অসীম সৌন্দর্য
 ii. অজানা আনন্দ
 iii. অপার বিস্ময়

কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

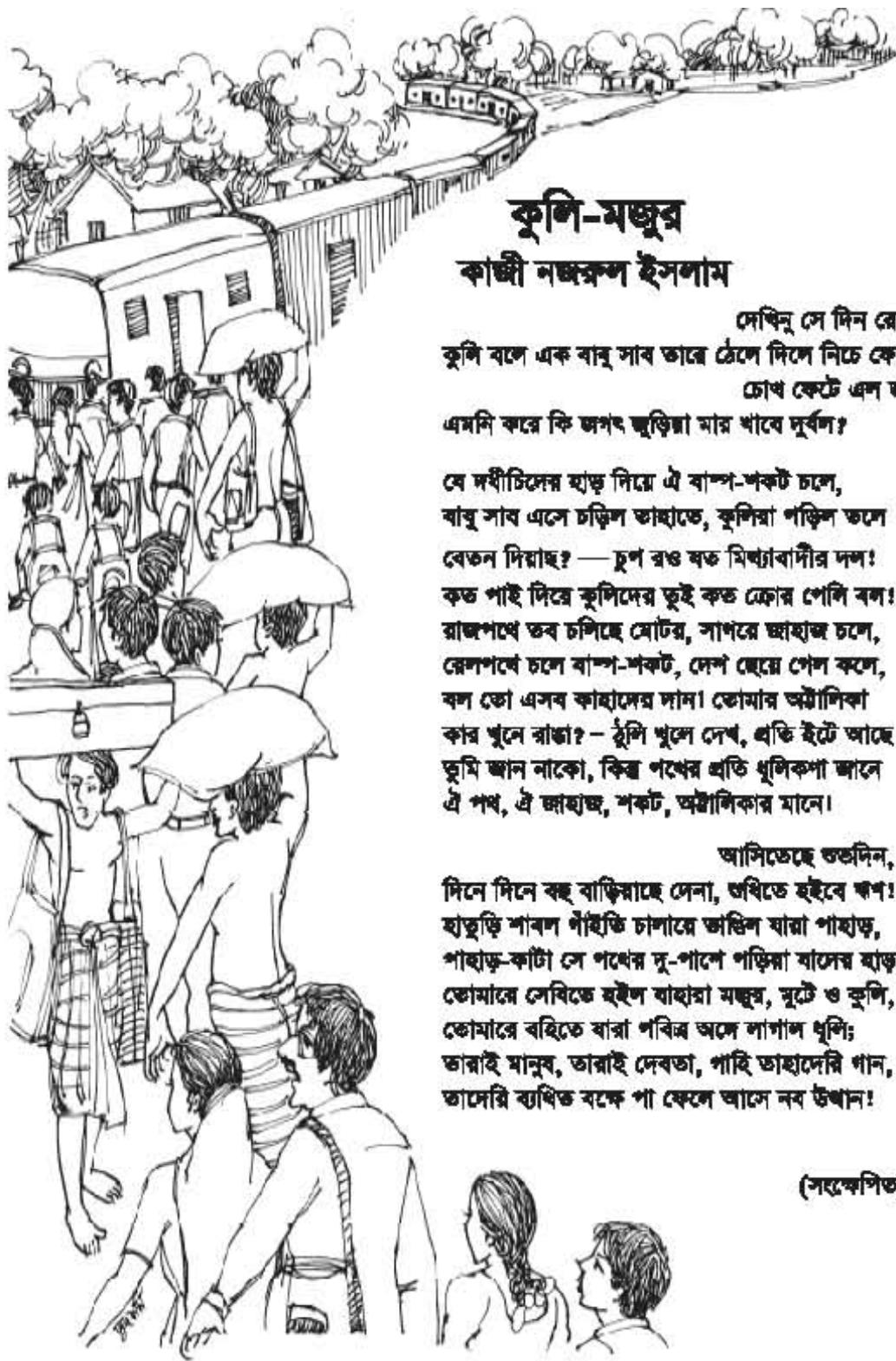
উদ্দীপকটি পত্তে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দেখা হয় নাই চঙ্গু মেলিয়া
 ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
 একটি ধানের শীষের উপরে
 একটি শিশির বিন্দু।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘নতুন দেশ’ কবিতার কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ ?
 ক. সীমাহীন কৌতূহল
 খ. প্রকৃতির রহস্য
 গ. অজানাকে জানা
 ঘ. অপার আকাঙ্ক্ষা
৪. উক্ত দিকটি ‘নতুন দেশ’ কবিতার কোন অংশে প্রতিফলিত হয়েছে ?
 ক. জানি না কোন দেশে / পৌছে যাবে শেষে
 খ. থাকি ঘরের কোণে / সাধ জাগে মোর মনে
 গ. পাহাড়-চূড়া সাজে / নীল আকাশের মাঝে
 ঘ. দূর সাগরের পারে / জলের ধারে ধারে

সূজনশীল প্রশ্ন

১. শীতের ছুটিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে হাদিতা বেড়াতে যায় সেন্টমার্টিন দ্বীপে। সেখানকার সামুদ্রিক প্রবাল, সারি সারি নারকেল গাছ, মাছ ধরার বড় বড় নৌকা ওর মনে কৌতুহল জাগায়। দিগন্ত বিস্তৃত নীলাভ জলরাশি, পরিষ্কার আকাশ ওকে নিয়ে যায় অন্য এক জগতে। ওর ইচ্ছে হয় সমুদ্রের নানা রঙের মাছের সঙ্গে খেলা করতে – আবার কখনো বা আকাশে পাখি হয়ে উড়ে বেড়াতে।
- ক. নীল আকাশের মাঝে কী সাজে?
- খ. ‘থাকি ঘরের কোণে’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- গ. হাদিতার সেন্টমার্টিনে দেখা দৃশ্যে ‘নতুন দেশ’ কবিতায় চিত্রিত কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “উদ্দীপকটি যেন ‘নতুন দেশ’ কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে আছে।”— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।



কুলি-মজুর কাজী নজরুল ইসলাম

দেখিনু সে দিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিলে নিচে কেলে!
চোখ কেটে এল জল,
এমনি করে কি জন্ম জুড়িয়া মার খাবে মুর্বল?

মে মধ্যিটিসের হাত্তি দিয়ে এই বাস্প-শকট চলে,
বাবু সাব এসে ঢাক্কিল তাহাতে, কুলিয়া পঞ্জিল তলে।
বেতন দিয়াছ? — চূল বাঁও ষষ্ঠ মিশ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের ফুই কত কেৱল পেলি বল!
রাজপথে তব চলিছে মোটো, সাধেরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাস্প-শকট, দেশে হেয়ে পেল কলে,
বল কো এসব কাহাদের দান! কোঘার অষ্টালিকা
কার খুনে রাঙা? — ঝুলি খুনে দেখ, অতি ইটে আছে লিখা।
কুমি আন নাকো, কিন্তু পথের অতি ধূলিকণা জানে
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অষ্টালিকার মানে!

আসিতেছে ততদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, অধিতে হইবে কথ!
হাতুড়ি শাবল পৈছাতি চালায়ে ভাসিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কঠা সে পথের দু-পাশে পঞ্জিরা বাসের হাত,
কোঘারে সেবিতে হইল বাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
কোঘারে বহিতে বারা পবিত্র অসে লাগাল ধূলি;
ভারাই থানুৰ, ভারাই দেবতা, পাহি তাহাদেরি ধান,
তাসেরি ব্যাধিত বকে পা কেলে আসে নব উধান!

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

- দধীচি**
- ভারতীয় পুরাণে উল্লিখিত একজন ত্যাগী মুনি। এ কবিতায় শ্রমজীবী কুলি-মজুরদের দধীচিমুনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে শ্রমজীবী মানুষেরা সভ্যতার বিস্তারে শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন তারাই আজ অবহেলিত। তাদের শ্রমের ওপর ভর করে যারা ধনী হয়েছেন, তারাই সকল সুবিধাতোগী। কবি দৃংখ করে ত্যাগী দধীচির সঙ্গে ত্যাগী কুলি-মজুরের তুলনা করেছেন।
- বাঞ্চ-শকট**
- ‘শকট’ মানে গাড়ি। বাঞ্চ-শকট হচ্ছে বাঞ্চ দ্বারা চালিত গাড়ি। এখানে রেলগাড়ি।
- পাই**
- মুদ্রার একক বিশেষ। এ কবিতায় ‘পাই’ বলতে কুলি-মজুরদের মজুরির ‘স্বল্পতা’ বোঝানো হয়েছে।
- ক্ষেত্র**
- কোটি।
- ঢুলি**
- চোখের ওপর ঢাকনি। গরুকে যখন ঘানিতে জোড়া হতো, তখন তার চোখে ঢাকনি পরানো হতো। এই ঢাকনির নাম ‘ঢুলি’। ‘ঢুলি খুলে’ মানে সচেতন হয়ে।
- অট্টালিকা**
- প্রাসাদ, অন্য কথায় সুউচ্চ দালান বা ইমারত।
- ‘দিনে দিনে বহু**
- বাড়িয়াছে দেনা’**
- অতীতকাল থেকে মানব সভ্যতা শ্রমজীবী মানুষদের অবদানে অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু প্রতিদানে তাঁরা পেয়েছেন অঞ্চল।
- শাবল**
- লোহার তৈরি মাটি খোড়ার হাতিয়ার।
- গাঁইতি**
- পাথর, ইট প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত কঠিন স্থান খোড়ার জন্য লাঙলের আকারের দুমুখো কুড়াল।
- বক্ষে**
- বুকে।
- নব উথান**
- কোনো ভালো কাজের জন্য নতুন করে উদ্যোগী হওয়া।

পাঠের উদ্দেশ্য

বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের ‘সাম্যবাদী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ‘কুলি-মজুর’ কবিতায় কবি মানবসভ্যতার যথার্থ রূপকার শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের পক্ষে কলম ধরেছেন।

যুগ যুগ ধরে কুলি-মজুরের মতো লক্ষকোটি শ্রমজীবী মানুষের হাতে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। এদেরই অক্লান্ত শ্রমে ও ধামে মোটর, জাহাজ, রেলগাড়ি চলছে। গড়ে উঠেছে দালানকোঠা, কলকারখানা। এদের শোষণ করেই ধনিকশ্রেণি হয়েছে বিন্দ-সম্পদের মালিক। কিন্তু যুগ যুগ ধরে সমাজে এই কুলি-মজুররাই সবচেয়ে বঢ়িত ও উপেক্ষিত। এক শ্রেণির হৃদয়হীন স্বার্থান্ব মানুষ এদের শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া বিন্দ-সম্পদের সবটুকুই ভোগ করছে অথচ এদের তারা মানুষ হিসেবে গণ্য করতেও নারাজ।

লেখক-পরিচিতি

অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বিপ্লব ও দেশপ্রেমের উদ্দীপনাময় কবিতা লিখে বাংলার জনমনে যিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে নদিত আসন পেয়েছেন, তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

বহু বিচিত্র ও বিস্ময়কর তাঁর জীবন। ছেলেবেলায় লেটোর দলে গান করেছেন, ঝটির দোকানের কারিগর হয়েছেন, সেনাবাহিনীর হাবিলদার হয়ে যুদ্ধে ঘোগ দিয়েছেন, ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে রাজদ্বারাহের অপরাধে কারাবরণ করেছেন। তিনি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

তিনি যে শুধু বড়দের জন্য লিখেছেন তা নয়, ছোটদের জন্য লেখা তাঁর কাব্যগুলি হচ্ছে — ‘বিঞ্চেফুল’, ‘সংগৰণ’, ‘পিলে পটকা’, ‘ঘূম জাগানো পাখি’, ‘ঘূম পাঢ়ানি মাসিপিসি’ এবং নাটক ‘পুতুলের বিয়ে’।

নজরুলের কবিতা ও গান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর রচিত ‘সংগ্রাম’ প্রস্ত্রের অন্তর্গত ‘চল চল চল’ গানটি আমাদের রণ-সংগীত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

নজরুলের জন্ম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে।

তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট (১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ই তাত্রি) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. তোমার দেখা বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের একটি তালিকা প্রণয়ন কর (দলীয় কাজ)।
- খ. তোমার দেখা একজন শ্রমজীবী মানুষের জীবন-যাপনের উপর একটি বিবরণী লেখ (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাজী নজরুল ইসলামের মতে কোনটিতে দেশ ছেয়ে গেল ?

ক. মোটরে	খ. জাহাজে
গ. কলে	ঘ. রেলগাড়িতে
২. ‘কুলি-মজুর’ কবিতায় কবি শ্রমজীবীদের জয়গান গেয়েছেন কারণ তারা —
 - i. অবহেলিত
 - ii. সভ্যতার নির্মাতা
 - iii. অধিকারবন্ধিত

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বৰৰ বলি যাহাদেৱ গালি পাড়িল ক্ষুদ্ৰমনা,
কৃপমণ্ডক ‘অসংযমী’র আখ্যা দিয়াছে যাবে,
তাৰি তাৱে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা কৰি তাৱে ।

৩. কবিতাংশের ক্ষুদ্ৰমনা’ কুলি-মজুর কবিতায় বৰ্ণিত কোন অংশের প্রতিনিধিত্ব কৰে ?

ক. বাবুসাবদেৱ

খ. মিথ্যাবাদীদেৱ

গ. দৰ্থীচিদেৱ

ঘ. কুলি-মজুরদেৱ

৪. কবিতাংশের মূলভাব ‘কুলি-মজুর কবিতাৰ নিচেৰ কোন চৱণে প্রতিফলিত হয়েছে ?

ক. দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঝণ

খ. তাৱাই মানুষ, তাৱাই দেবতা, গাহি তাহাদেৱি গান

গ. তাদেৱই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উথান

ঘ. তোমারে বহিতে যাবা পৰিত্ব অঙ্গে লাগাল ধূলি

সূজনশীল প্ৰশ্ন

১। চেয়াৰম্যান আজমল সাহেবেৰ এলাকায় একজন ভালো মানুষ হিসেবে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে, কিন্তু তাঁৰ ছেলে কাৰণে-অকাৰণে বাড়িৰ কাজেৰ লোক, আশপাশেৰ খেটে খাওয়া মানুষেৰ সাথে খারাপ আচৰণ কৰে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰে। চেয়াৰম্যান ছেলেকে ডেকে বুঝিয়ে বলেন, তুমি যাদেৱ আজ তুচ্ছ জ্ঞান কৰছ — সত্যিকাৰ অৰ্থে তাৱাই আধুনিক সভ্যতাৰ নিৰ্মাতা, তাদেৱ কাৰণেই আমোৰা সুন্দৰ জীবন যাপন কৰছি।

ক. ‘কুলি-মজুৰ’ কবিতায় রেলপথে কোনটি চলে?

খ. ‘শুধিতে হইবে ঝণ’— কথাটিৰ দ্বাৰা কী বোৰানো হয়েছে?

গ. চেয়াৰম্যান সাহেবেৰ ছেলেৰ আচৰণে ‘কুলি-মজুৰ’ কবিতাৰ কোন দিকটি প্ৰকাশ পেয়েছে — ব্যাখ্যা কৰ।

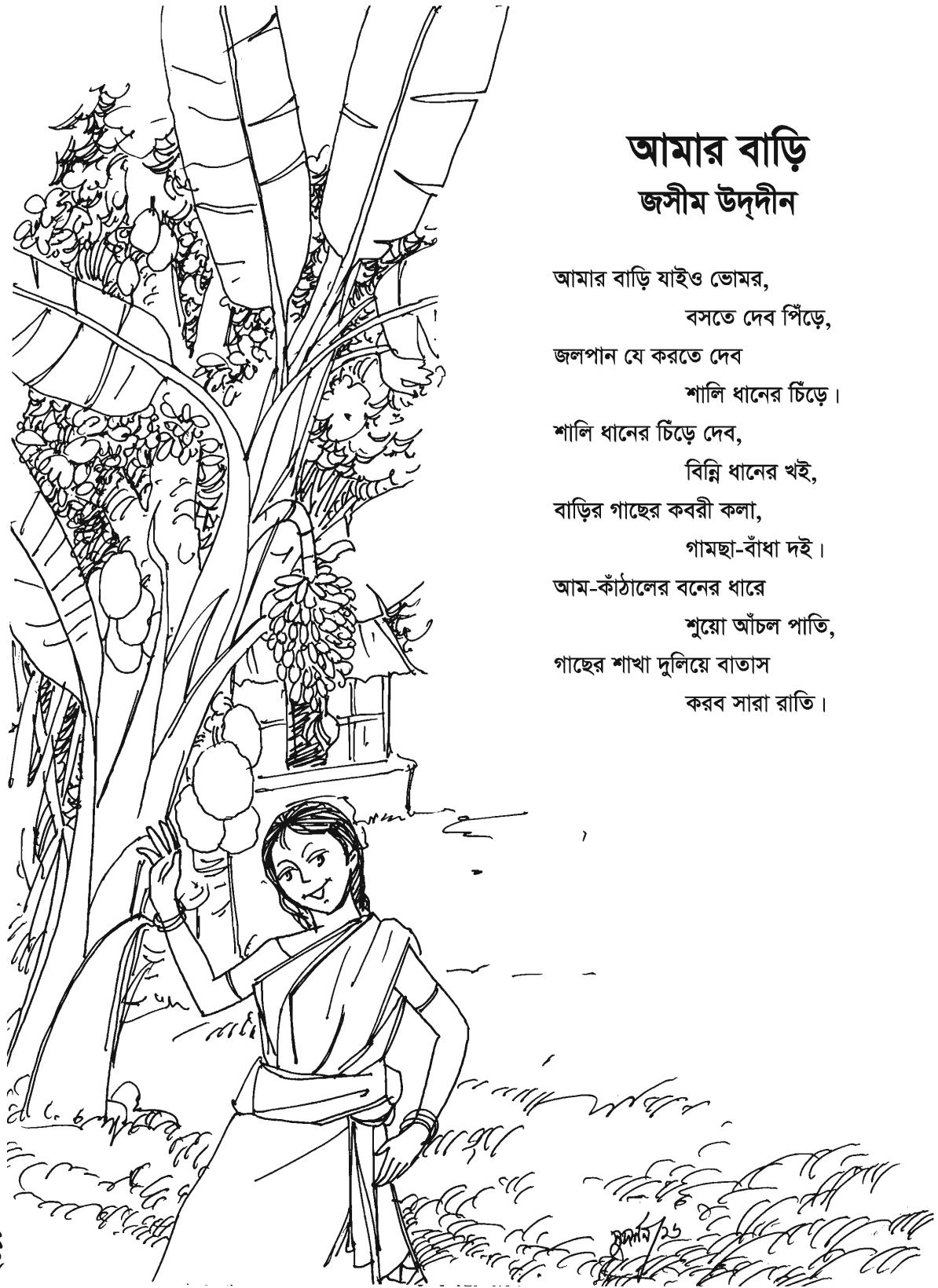
ঘ. ‘চেয়াৰম্যান সাহেবেৰ মনোভাব ‘কুলি-মজুৰ’ কবিতাৰ মূলভাবেৱই প্রতিফলন’ — বিশ্লেষণ কৰ।’

আমার বাড়ি জসীম উদ্দীন

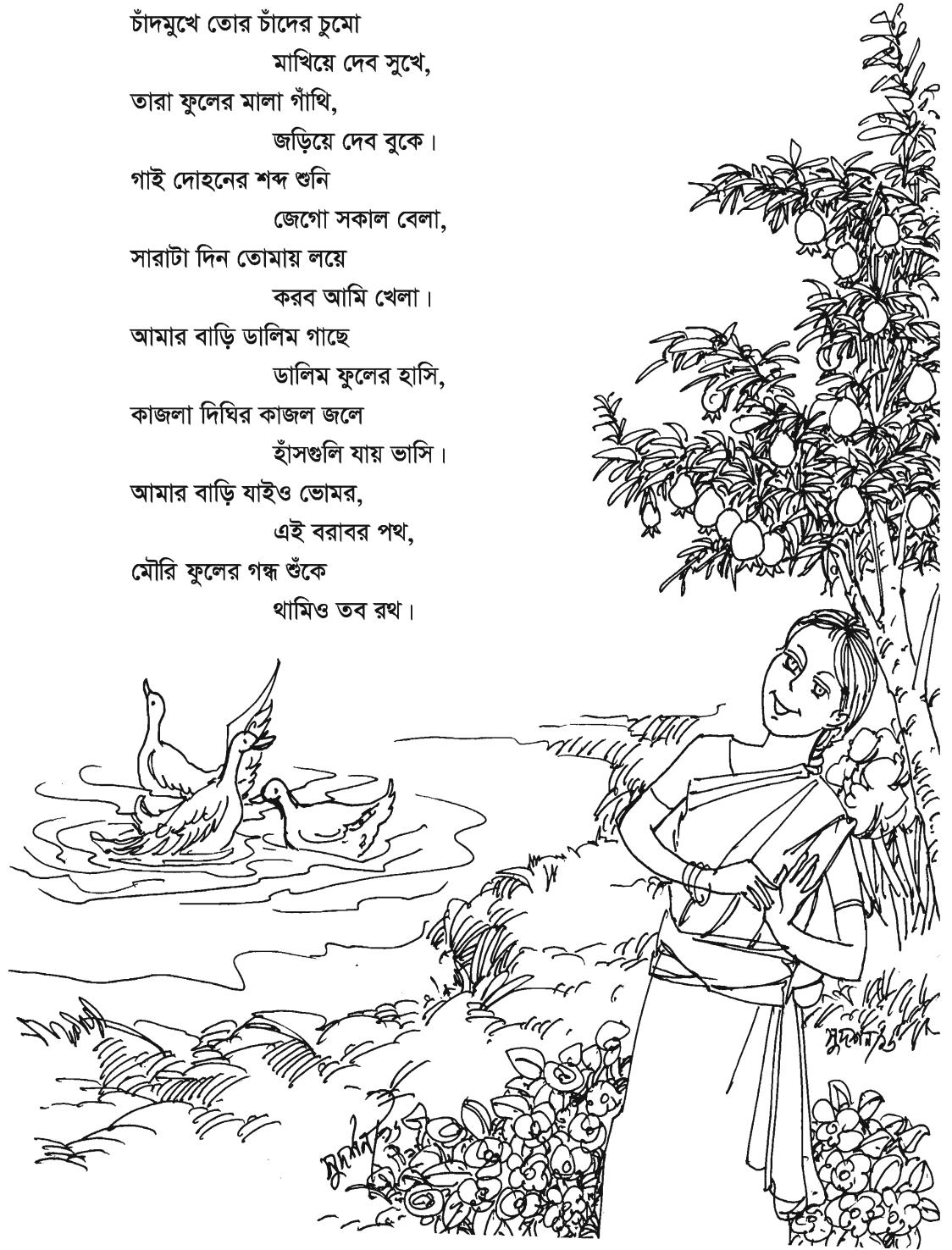
আমার বাড়ি যাইও ভোমর,
বসতে দেব পিঁড়ে,
জলপান যে করতে দেব
শালি ধানের চিঁড়ে।

শালি ধানের চিঁড়ে দেব,
বিন্দি ধানের খই,
বাড়ির গাছের কবরী কলা,
গামছা-বাঁধা দই।

আম-কাঠালের বনের ধারে
শুয়ো আঁচল পাতি,
গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস
করব সারা রাতি।



চাঁদমুখে তোর চাঁদের চুমো
 মাখিয়ে দেব সুখে,
 তারা ফুলের মালা গাঁথি,
 জড়িয়ে দেব বুকে ।
 গাই দোহনের শব্দ শুনি
 জেগো সকাল বেলা,
 সারাটা দিন তোমায় লয়ে
 করব আমি খেলা ।
 আমার বাড়ি ডালিম গাছে
 ডালিম ফুলের হাসি,
 কাজলা দিঘির কাজল জলে
 হাঁসগুলি যায় ভাসি ।
 আমার বাড়ি যাইও ভোমর,
 এই বরাবর পথ,
 মৌরি ফুলের গন্ধ শুকে
 থামিও তব রথ ।



শব্দার্থ ও টীকা

ভোমর	— মৌমাছি। ভমরের কথ্য রূপ ভোমর। কবিতাটিতে কোনো বঙ্গ বা প্রিয়জনকে ভোমর বলে সম্মোধন করে নিজের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
শালি ধান	— এক প্রকার আমন ধান, যা হেমন্তকালে উৎপন্ন হয়।
বিন্নি ধান	— বাংলাদেশের আদি জাতের ধানগুলোর একটি।
কবরী কলা	— স্বাদের জন্য বিখ্যাত এক প্রকার কলা।
‘গামছা-বাঁধা দই’	— অধিক ঘনত্বের ফলে যে দই গামছায় রাখলেও রস গড়িয়ে পড়ে না।
‘শুয়ো আঁচল পাতি’	— আঁচল পেতে শুয়ে থেকো।
‘গাই দোহনের শব্দ’	— গাভীর দুখ দোহনের শব্দ।
কাজলা দিঘি	— কাজলের মতো কালো জলের দিঘি।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের সৌজন্য, শিষ্টাচার ও মানবপ্রেমে উত্তুল করা।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি কবি জসীম উদ্দীনের ‘হাসু’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এখানে কোনো বঙ্গ বা প্রিয়জনকে নিজের গ্রামের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন কবি। তিনি তাকে আপ্যায়ন করতে চান শালি ধানের ঢিড়া, বিন্নি ধানের খই, কবরী কলা এবং গামছা বাঁধা দই দিয়ে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে কেমন করে অতিথির প্রাণ জুড়াবে তারও এক নিবিড় পরিচয় আছে কবিতাটিতে। যুগ যুগ ধরেই অতিথি আপ্যায়নে বাঙালির সুনাম রয়েছে। অতিথির বিশ্রাম ও আনন্দের জন্য গৃহস্থের আন্তরিক প্রয়াস এ কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অতিথি যে গৃহে এসেছেন সেই গৃহের গাছ, ফুল, পাখি ও যেন অতিথিকে আপ্যায়নে উন্মুখ হয়ে আছে। অতিথিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সৌজন্য, শিষ্টাচার ও মানবপ্রেমের অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ কবিতায়।

কবি-পরিচিতি

কবি জসীম উদ্দীন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবিতায় আমরা পল্লির মানুষ ও প্রকৃতির সহজ-সুন্দর রূপটি দেখতে পাই। পল্লির মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর কবিহৃদয় যেন এক হয়ে মিশে আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাহিনিকাব্য : ‘নীরী কাঁথার মাঠ’, ‘সৌজন বাদিয়ার ঘাট’; কাব্যগ্রন্থ : ‘রাখালী’, ‘বালুচর’, ‘মাটির কানা’; নাটক : ‘বেদের মেয়ে’। তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থে রয়েছে ‘হাসু’, ‘এক পয়সার বাঁশী’, ‘ডালিমকুমার’। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. তোমার বাড়িতে অতিথি এলে কীভাবে তাঁর যত্ন নেওয়া হয়, বর্ণনা কর। (একক কাজ)
- খ. বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী খাবারসমূহের (অঞ্চলভিত্তিক) তালিকা তৈরি কর। (দলীয় কাজ)

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘আমার বাড়ি’ কবিতায় কবি বস্তুকে কোন ধানের চিঠ্ঠা খেতে দিবেন ?

- | | | | |
|----|------|----|------|
| ক. | শালি | খ. | আমন |
| গ. | বোরো | ঘ. | বিলি |

২. ‘থামিও তব রথ’ - দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে ?

- | | | | |
|----|-----------------|----|----------|
| ক. | যাত্রাবিরতি | খ. | রথ দেখা |
| গ. | গন্তব্যে পৌছানো | ঘ. | রথ চালনা |

কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উভর দাও :

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
ফুল তুলিতে যাই —
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই

ঝড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়েতে সুখ,
পাকা জামের শাখায় উঠি
রঙিন করি মুখ ।

৩. উদ্ধৃতির প্রথম স্তবকের সাথে নিচের কোন চরণ/ চরণসমূহে মিল লক্ষ করা যায়-

- i. আমার বাড়ি যাইও ভোমর / বসতে দেব পিঁড়ে ।
- ii. গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস / করব সারা রাতি ।
- iii. তারা ফুলের মালা গাঁথি / জড়িয়ে দেব বুকে ।

কোনটি সঠিক ?

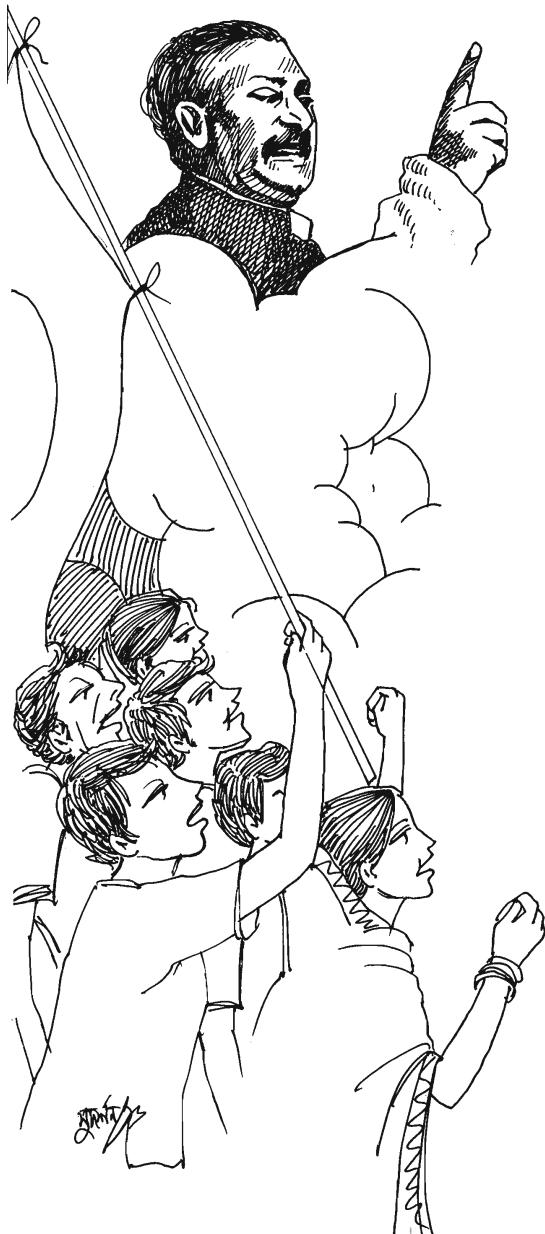
- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

৪. উদ্ধৃতির দ্বিতীয় স্তবকের সাথে ‘আমার বাড়ি’ কবিতার মিল কোথায় ?

- | | | | |
|----|----------------|----|------------|
| ক. | প্রকৃতিতে | খ. | নিমন্ত্রণে |
| গ. | খাদ্য-বর্ণনায় | ঘ. | বস্তুতে |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. তুমি যাবে ভাই — যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়,
 গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়,
 মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি
 মোর গেহখানি রহিয়াছে ভরি
 মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভায়ের স্নেহের ছায়।
- ক. ‘আমার বাড়ি’ কবিতায় কাজলা দীঘির কাজল জলে কী হাসে?
- খ. ‘আমার বাড়ি’ কবিতায় কবি বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কেন?
- গ. উদ্দীপকের প্রথম চরণের সাথে ‘আমার বাড়ি’ কবিতার কোন অংশের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপক ও ‘আমার বাড়ি’ কবিতার ভাবার্থ কি এক? বিশ্লেষণ কর।



শোন একটি মুজিবরের থেকে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

শোন একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণ
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ ।।

সেই সবুজের বুক চেরা মেঠোপথে
আবার যে যাব ফিরে, আমার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব
শিল্পে - কাব্যে কোথায় আছে
হায়রে এমন সোনার খনি ।।

বিশ্বকবির ‘সোনার বাংলা’
নজরগলের ‘বাংলাদেশ’
জীবনানন্দের ‘রূপসী বাংলা’
রূপের যে তার নেই কো শেষ, বাংলাদেশ ।

‘জয় বাংলা’ বলতে মনরে আমার
এখনো কেন ভাব, আমার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব
অঙ্ককারে পুব আকাশে
উঠবে আবার দিনমণি ।।

শব্দার্থ ও টীকা

- ‘একটি মুজিব’ — ‘একজন মুজিব’। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির আশা-ভরসার একক আশ্রয়স্থল।
- ‘লক্ষ মুজিবরের
কঠস্বরের ধ্বনি’ — একান্তরে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকঠে স্বাধীনতা আহ্বানের মধ্য দিয়ে যেন লক্ষ বাঙালির মিলিত কঠস্বর স্বাধীনতার জন্য গর্জে উঠেছিল।

- ‘হারানো বাংলাকে
আবার তো ফিরে
পাব’ —— একসময় এই বাংলা ছিল স্বাধীন জনপদ। ১৯৫৭ সালে তা ব্রিটিশদের কাছে স্বাধীনতা হারায়। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগে এই দেশ – পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে বিভক্ত পূর্ববাংলা পরিচিতি পায় পূর্ব পাকিস্তান নামে। পাকিস্তানের ২৩ বছরের চাপিয়ে দেওয়া দুঃশাসনে বাঙালি একে একে হারাতে বসে সব অধিকার। মহান মুক্তিযুদ্ধে কাঞ্চিত বিজয়ের মাধ্যমে সেই হারানো স্বাধীন পূর্ব বাংলাকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে।
- বিশ্বকবির
‘সোনার বাংলা’ —— বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দেশকে ‘সোনার বাংলা’ বলে অভিহিত করেছেন তাঁর রচিত একটি দেশাত্মক গানে – যার প্রথম দশ চরণ আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত।
- নজরুলের
‘বাংলাদেশ’ —— ‘বাংলাদেশ’ শিরোনামের প্রথম কবিতাটি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা। তাঁর কবিতা, সংগীত ও প্রবন্ধে বাংলা ও বাঙালির মুক্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে বারবার। মহান মুক্তিযুদ্ধে নজরুলের উদ্দীপনামূলক লেখাগুলো ছিল আমাদের অন্তর্ভুক্ত প্রেরণার উৎস।
- জীবনানন্দের
‘রূপসী বাংলা’ —— নিসর্গের কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলার প্রকৃতির অনিন্দ্য রূপ সৌন্দর্য চিরায়ত মহিমায় উপস্থাপন করেছেন তাঁর ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থে।
- ‘জয় বাংলা
বলতে.....ভাব’ —— পাকিস্তান বিরোধী সকল সংগ্রাম-আন্দোলনে ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানেই প্রকাশিত হতো সারা দেশ। জয় সুনিশ্চিত ও অবশ্য়ক জেনে দ্বিধাহীন চিন্তে এই একটি শ্লোগানেই সংযুক্ত হয়েছিল সমগ্র বাঙালি জাতি।

পার্টের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বৃদ্ধ করা।

পাঠ-পরিচিতি

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই গানটি অন্যান্য গানের সাথে বারবার বাজানো হতো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। গানটির সুরকার ও শিল্পী ছিলেন বিখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী অংশুমান রায়। অসামান্য জনপ্রিয় হওয়ার পর গৌরীপ্রসন্ন নিজেই এই গানটিকে ‘The voice of not one, but million mujibors singing’ শিরোনামে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন, যা গেয়েছিলেন শিল্পী কবরী নাথ।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে এই দেশে হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্বিচারে বাঙালি জনগণের উপর হত্যায়জ্ঞের সূচনা করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপরই তাঁকে ছেফতার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর ২০ আহ্বানে সাড়ি দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। এর আগে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছিলেন ‘এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম’। তাঁর বজ্রকঠ্টের আহ্বান ঐ মুহূর্তেই

সমগ্র বাংলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস কারাগারে বন্দি থাকলেও তাঁর স্বাধীনতার ডাক কোটি বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা হয়ে বেজেছে চারদিকে। পাকিস্তান-বিরোধী সকল সংগ্রাম-আন্দোলনে সারা দেশেই প্রচার করা হতো তাঁর ভাষণ-বক্তৃতা। মুক্তিযোদ্ধাসহ স্বাধীনতাকামী সকল মানুষের রক্তে-চেতনায় তা প্রগোদ্ধনা জাগাতো।

কবি-পরিচিতি

আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগের কিংবদন্তি গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (জন্ম: ১৯২৪ - মৃত্যু: ১৯৮৬) এর আদি পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলায়। ‘কফি হাউসের সেই আভাটা’, ‘ও নদীরে’, ‘নিশিরাত বাঁকা চাঁদ’, ‘মঙ্গল দীপ ঝঁঁলে’, ‘যদি হিমালয়- আল্পসের’, ‘ও পলাশ ও শিমুল’, ‘আকাশ কেন ডাকে’ সহ তাঁর লেখা অসংখ্য গান আমাদের সংগীত জগতের চিরায়ত সম্পদ বলে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি গান যেমন ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে’, ‘আমরা সবাই বাঙালি’, ‘মাগো ভাবনা কেন’, ‘পথের ক্লান্তি ভুলে’ – ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষকে অন্তর্হীন প্রেরণা যুগিয়েছিল।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়াত গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে ‘মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা’ জানানো হয় ২০১২ সালে।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম অবলম্বনে দেয়ালপত্রিকা প্রকাশ কর। [দলীয় কাজ]
- খ. শিল্পী, গীতিকার ও সুরকারের নাম উল্লেখসহ ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে প্রচারিত উদ্দীপনামূলক গানগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর।

নমুনা প্রশ্ন

বন্ধনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘সেই সবুজের বুক চেরা’ পথটি কেমন?

ক. পাকা	খ. মেঠো
গ. ভাঙা	ঘ. গ্রাম্য
২. কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বাংলাকে ‘সোনার খনি’ বলা হয়েছে?

ক. লড়াই-সংগ্রাম	খ. শিল্প-কার্য
গ. সংগীত	ঘ. ত্রীড়াশৈলী

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জীবন্দানের প্রতিজ্ঞা লয়ে লক্ষ সেনা পাছে
তোমার হৃকুম তামিলের লাগি সাথে তব চলিয়াছে।

৩. কবিতাংশের ‘তোমার হকুম’ ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে’ কবিতার কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
- গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
 - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
 - কাজী নজরুল ইসলাম
 - জীবনানন্দ দাশ
৪. উপর্যুক্ত সাদৃশ্যের কারণ, তিনি-
- বাঙালির জাতির পিতা
 - স্বাধীনতার স্বপ্ন-দিশারী
 - বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা

কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|---------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | ii ও iii |
| গ. | i ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

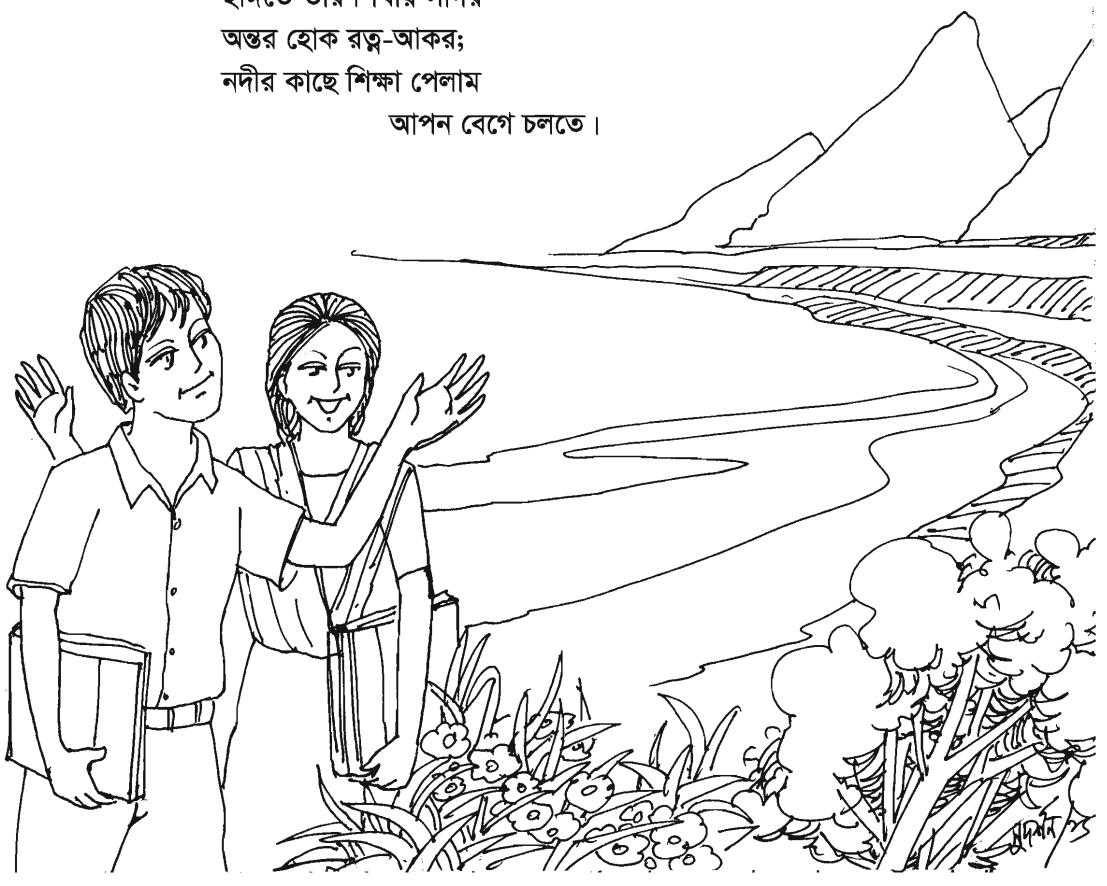
১. মুজিবুর রহমান
ওই নামে যেন বিস্মিল্যাসের অঙ্গ-উগারী বাণ।
বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে
জ্বালায় জ্বালিছে মহাকালানন্দ ঝঞ্চা অশনি বেয়ে।
মায়ের বুকের ভায়ের বুকের বোনের বুকের জ্বালা,
তব সম্মুখে পথে পথে আজ দেখায়ে চলিছে আলা।
- কেন কবির চোখে বাংলাদেশ ‘রূপসী বাংলা?’
 - ‘অঙ্গকারে পুর আকাশে উঠিবে আবার দিনমণি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
 - উদ্দীপকের ২য় চরণে ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
ব্যাখ্যা কর।
 - উদ্দীপকটি ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে’ কবিতার সম্পূর্ণভাব বহন করে কি? স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সবার আমি ছাত্র

সুনির্মল বসু

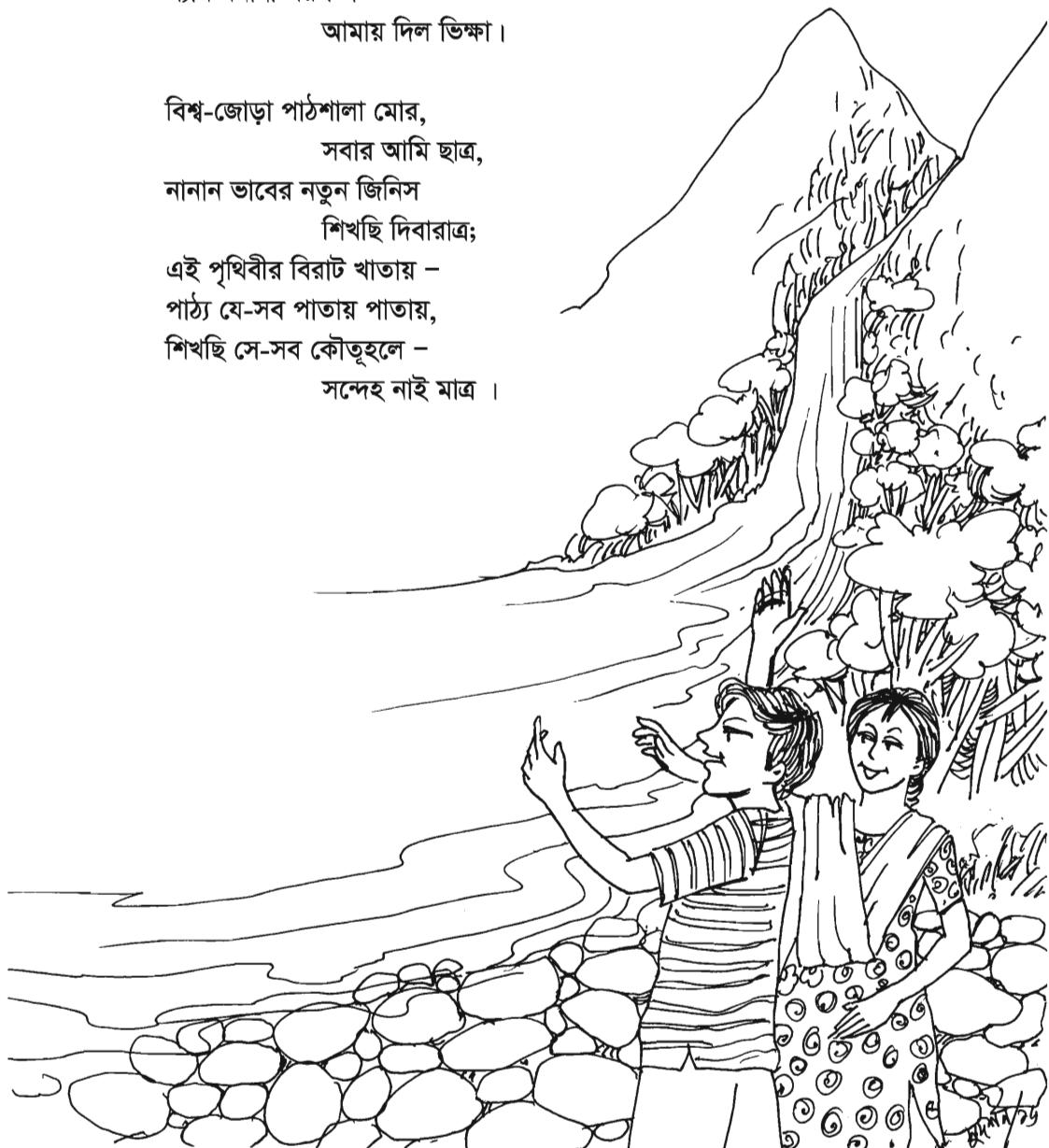
আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন-মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে –
দিল-খোলা হই তাই রে।

সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখালো হাসতে মিঠে,
মধুর কথা বলতে।
ইঙিতে তার শিখায় সাগর –
অন্তর হোক রত্ন-আকর;
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে।



মাটির কাছে সহিষ্ঠুতা
 পেলাম আমি শিক্ষা,
 আপন কাজে কঠোর হতে
 পায়াণ দিল দীক্ষা ।
 ঝরনা তাহার সহজ গানে
 গান জাগালো আমার প্রাণে,
 শ্যাম বনানী সরসতা
 আমায় দিল ভিক্ষা ।

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর,
 সবার আমি ছাত্র,
 মানান ভাবের নতুন জিনিস
 শিখছি দিবারাত্র;
 এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় –
 পাঠ্য যে-সব পাতায় পাতায়,
 শিখছি সে-সব কৌতুহলে –
 সন্দেহ নাই মাত্র ।



শব্দার্থ ও টীকা

দিল-খোলা	— মনখোলা, মুক্তমন।
মন্ত্রণা	— উপদেশ, যুক্তি-পরামর্শ, প্রেরণা।
সহিষ্ণুতা	— সহ্য করার ক্ষমতা।
পাষাণ	— পাথর।
শ্যাম বনানী	— সবুজ বন।
মৌন-মহান	— ধৈর্যে-স্ত্রৈর্যে পাহাড়ের মতো মৌন বা নীরব এবং গুণে-কর্মে পাহাড়ের মতো সুউচ্চ বা মহান হ্বার কথা বলা হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীকে সততা ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বৃদ্ধ করা।

পাঠ-পরিচিতি

জন্মগতভাবেই বেঁচে থাকার জন্য মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। মানবিক ও নৈতিক শিক্ষালাভেও প্রকৃতি সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি। আকাশের অসীমতা আমাদের উদারতা শেখায়। আমাদের কর্মপ্রেরণার বড় উৎস নিরসন বায়ু-প্রবাহ। পাহাড়ের উচ্চতা আমাদের উদারতা শিখতে উৎসাহ জোগায়। আত্মত্যাগের আরেকটি বড় উদাহরণ সূর্য। সে তার নিজের আলো দিয়ে সবাইকে আলোকিত করে। সাগর তার বুকে যুগ যুগ ধরে বিশাল রত্নভাণ্ডার সংরক্ষণ করে নীরবে মানবকল্যাণ করে যায়। নদী আমাদের গতিশীল থাকার শিক্ষা দেয়। গতিময় ঝরনা মনকে ভেতর থেকে চলমান রাখতে সাহায্য করে। সবুজ বন আমাদের মনকে রাখে সজীব। মাটি নিজে যেমন সব কিছু সহ্য করতে পারে, তেমনি অন্যদেরও সে সহিষ্ণুতা শিখায়। নিজের সব কাজে দৃঢ় থাকাটা, পাথরের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি। এভাবে পৃথিবীর সকল বস্তু বা ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই আমাদের পথ চলতে হবে।

কবি পরিচিতি

সুনির্মল বসু ১৯০২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিহারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বৃহত্তর ঢাকার বিক্রমপুরে। তিনি ছিলেন কবি ও শিশুসাহিত্যিক। কবিতা, গল্প কাহিনি, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি বিষয়ে শিশু ও কিশোর উপযোগী সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ‘ছানাবড়া’, ‘বেড়ে মজা’, ‘হৈচে’, ‘হলসুল’, ‘কথা শেখা’, ‘পাততাড়ি’ ইত্যাদি। ১৯৫৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনাচক্র ও বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর। [দলগত কাজ]
- খ. মানুষের জন্য কল্যাণকর গুণসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
- গ. তোমার পরিচিত একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সম্পর্কে লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বৃত্তিবিচানি প্রশ্ন

১. কবিতায় আপন কাজে কঠোর হওয়ার শিক্ষা দেয় কোনটি ?

ক. পাহাড়	খ. পাষাণ
গ. ঝরনা	ঘ. মাটি

 ২. ‘এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

ক. পৃথিবীতে অজানা বলে কিছু নেই	খ. পৃথিবীকে বিরাট খাতা বলা হয়েছে
গ. পৃথিবীর সবকিছুই জ্ঞানের আধার	ঘ. প্রকৃতি বড় একটি খাতা বিশেষ

 ৩. যখন মানবকুল ধনবান হয়
 তখন তাদের শির সমুন্নত রয়
 কিন্তু ফলশালী হলে এই তরঙ্গণ
 অহংকারে উচ্চ শির না করে কখন
 – উদ্দীপকের সাথে ‘সবার আমি ছাত্র’ কবিতার সঙ্গতিপূর্ণ চরণ –
 - i. শ্যাম বনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা
 - ii. মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা
 - iii. আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাইরে
- কোনটি সঠিক ?**
- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |
৮. উদ্দীপকে ‘সবার আমি ছাত্র’ কবিতার কোন শিক্ষণীয় দিকটি ফুটে উঠেছে ?

ক. নত না হওয়া	খ. শিক্ষা অর্জন করা
গ. মিলে মিশে থাকা	ঘ. উদ্বান্ত না হওয়া

সূজনশীল প্রশ্ন

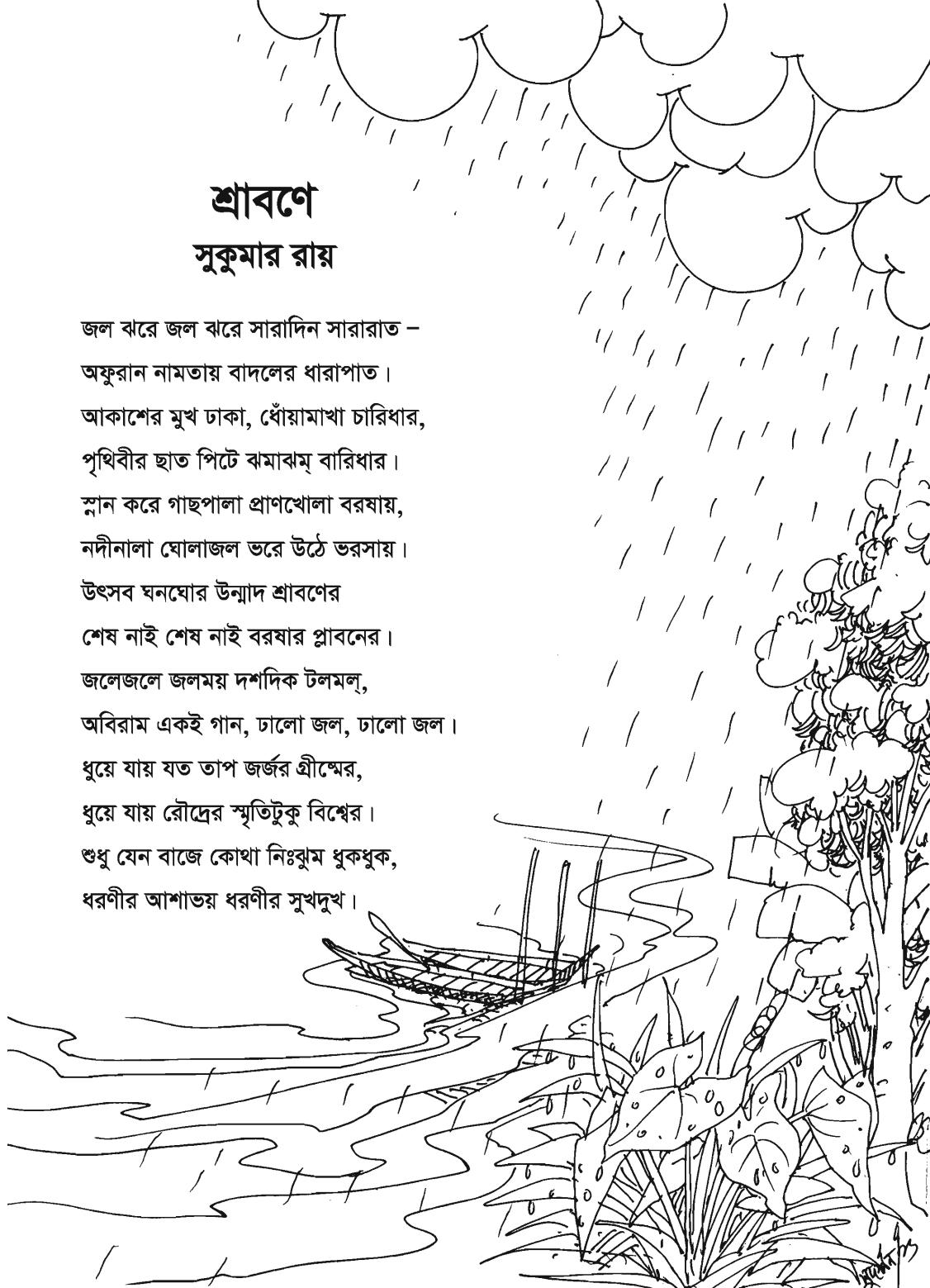
১. উদ্দীপক ১ম অংশ : মন্ত্রার পথে প্রান্তরে পৌত্রলিকের প্রস্তরঘায়ে মহানবি আহত হইয়াছেন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বারবার উপহাসিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অন্তর ভেদিয়া একটি মাত্র প্রার্থনার বাণী জাগিয়াছে; – ‘এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর’।

উদ্বীপক ২য় অংশ : মহানবি হয়রত মুহাম্মদ (স.) সবার আদর্শ ও অনুকরণীয়ও বটে। সদা হাস্যোজ্জ্বল ও মিষ্টভাষী মহানবি সবার কাছে ‘মাটির মানুষ’। তাঁর সান্নিধ্যে সবাই যেমন কাজে গতি পেত, তেমনি সবাই তাঁর কাছ থেকে শিখেছিল সুন্দর সুন্দর চিন্তা করতে। আর প্রয়োজনে কঠিন হতেও তিনি পিছপা হতেন না।

- ক. কোনটি আমাদেরকে ‘দিল খোলা’ হওয়ার শিক্ষা দেয়?
- খ. ‘সবার আমি ছাত্র’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
- গ. উদ্বীপকের ১ম অংশে ‘সবার আমি ছাত্র’ কবিতার কোন অংশের পরিচয় রয়েছে – ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মহানবি হয়রত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনাদর্শ যেন মানুষের জন্য ‘বিশ্বজোড়া পাঠশালা’র মতোই – উদ্বীপক ও কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

ଆବଣେ সুକୁମାର ରାୟ

ଜଳ ଘରେ ଜଳ ଘରେ ସାରାଦିନ ସାରାରାତ -
ଅଫୁରାନ ନାମତାଯ ବାଦଲେର ଧାରାପାତ ।
ଆକାଶେର ମୁଖ ଢାକା, ଧୋଯାମାଖା ଚାରିଧାର,
ପୃଥିବୀର ଛାତ ପିଟେ ବରାବରମ୍ ବାରିଧାର ।
ଶାନ କରେ ଗାହପାଳା ଥାଗଖୋଲା ବରଷାୟ,
ନଦୀନାଲା ଘୋଲାଜଳ ଭରେ ଉଠେ ଭରସାୟ ।
ଉତ୍ସବ ଘନଘୋର ଉନ୍ନାଦ ଆବଣେର
ଶେଷ ନାଇ ଶେଷ ନାଇ ବରଷାର ପ୍ଲାବନେର ।
ଜଲେଜଲେ ଜଳମୟ ଦଶଦିକ ଟଳମଳ,
ଅବିରାମ ଏକଇ ଗାନ, ଢାଲୋ ଜଳ, ଢାଲୋ ଜଳ ।
ଧୂଯେ ଯାଯ ଯତ ତାପ ଜର୍ଜର ଗ୍ରୀମେର,
ଧୂଯେ ଯାଯ ରୌଦ୍ରେର ଶୃତିଟୁକୁ ବିଶେର ।
ଶୁଦ୍ଧ ଯେନ ବାଜେ କୋଥା ନିଃବୁମ ଧୁକଧୁକ,
ଧରଣୀର ଆଶାଭୟ ଧରଣୀର ସୁଖଦୁଖ ।



শব্দার্থ ও টীকা

‘অফুরান নামতায়’

বাদলের ধারাপাত’	গণিতে ‘নামতা’ বলতে বোঝায় শুণ করার ধারাবাহিক তালিকা; আর ‘ধারাপাত’ হলো অঙ্গ শেখার প্রাথমিক বই। এ কবিতায় বৃষ্টিধারার পতনকে বলা হচ্ছে ধারাপাত; বৃষ্টির পতনের অবিরাম রিমারিম ধ্বনি অনেকটা যেন শিশুদের নাম্ভতা পড়ার শব্দের মতো।
ছাত	ছাদ। ছাদের কথ্য রূপ ছাত।
বারিধার	জলের ধারা।
উন্নাদ	উন্নাস্ত, ক্ষিণ্ঠ। শ্রাবণ মাসে অবিরাম ধারা বর্ষণ ঘটে বলে কবি এখানে শ্রাবণকে ‘উন্নাদ শ্রাবণ’ বলেছেন।
জর্জর	কাতর।
নিঃযুম	নিঃবুম, নীরব, নিঃশব্দ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ে আকৃষ্ট করে তোলা।

পাঠ-পরিচিতি

‘শ্রাবণে কবিতাটি’ সুকুমার রায়ের ‘খাই খাই’ ছড়াগ্রন্থের অন্তর্গত। গ্রীষ্মের দাবদাহে জর্জরিত প্রকৃতি অবিরাম বর্ষায় স্নান করে সজীব ও প্রাণবন্ত রূপ ধারণ করেছে, কবিতায় সে ছবিই আঁকা হয়েছে। বর্ষার জলে গাছপালা নদী-নালা থেকে শুরু করে রক্ষ প্রকৃতি মুহূর্তেই জলে পরিপূর্ণ হয়। প্রকৃতিতে প্রাণের সংঘার ঘটে। গ্রীষ্মকালের রোদের চিহ্ন ধূয়ে মুছে প্রকৃতি এ সময় নতুন রূপ ধারণ করে। এভাবেই ঝুতুর পালাবদলের মতো মানব-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের পালাবদল ঘটে।

কবি পরিচিতি

শিশু-কিশোর পাঠকদের কাছে সুকুমার রায় একটি প্রিয় নাম। তাঁর আদি পৈত্রিক নিবাস ময়মনসিংহ জেলায়। বাংলা সাহিত্যে তিনি অমর হয়ে আছেন প্রধানত রসের কবিতা, হাসির গল্প, নাটক ইত্যাদি শিশুতোষ রচনার জন্য। ‘আবোল তাবোল’, ‘হ্যবরল’, ‘পাগলা দাশু’ প্রভৃতি তাঁর অতুলনীয় রচনা। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী একজন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। কিংবদন্তি চলচিত্র-নির্মাতা ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক সত্যজিত রায় তাঁর পুত্র। সুকুমার রায়ের কলকাতায় জন্ম ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে।

কর্ম-অনুশীলন

ক. শ্রাবণ মাসে তোমার এলাকায় কী কী পরিবর্তন ঘটে? লেখ।

খ. বর্ষার গান ও কবিতা নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শ্রাবণের জল অবিরাম করে –

ক. সংগীতের মতো	খ. কোলাহলের মতো
গ. গণিতের মতো	ঘ. নামতার মতো

২. ‘অবিরাম একই গান’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. বর্ষার প্লাবন	খ. নদীর ঘোলাজল
গ. একটানা বৃষ্টি	ঘ. সংগীত সন্ধ্যা

৩. বর্ষণমুখের দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
রৌদ্র-দন্থ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
– উদ্দীপকটি ‘শ্রাবণে’ কবিতার যে দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. অবিরাম বৃষ্টি	খ. মেঘলা আকাশ
গ. বৃষ্টিস্মৃত প্রকৃতি	ঘ. তাপ ধুয়ে যাওয়া

৪. ‘বৃষ্টি এল কাশবনে জাগল সাড়া ঘাসবনে’
– উদ্দীপকের ভাবধারা ‘শ্রাবণে’ কবিতার কোন পঙ্ক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত	খ. আকাশের মুখ ঢাকা, ধোয়ামাখা চারিধার
গ. প্লান করে গাছপালা আগখোলা বরষায়	ঘ. নদীনালা ঘোলাজল তরে উঠে ভরসায়

সূজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক (১) আজিকার রোদ ঘুমায়ে পড়িছে— ঘোলাটে মেঘের আড়ে,

কেয়া বন পথে স্বপন বুনিছে— ছল ছল জলধারে।

কাহার ঝিয়ারী কদম্ব শাখে— নিষ্ঠাম নিরালায়,

ছোট ছোট রেণু খুলিয়া দিয়াছে— অঙ্গুট কলিকায়।

উদ্দীপক (২) কেউবা রঙিন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপনখানি,

তারে ভাষা দেয় দীঘল সূতার মায়ারী আখর টানি।

ক. প্রাণখোলা বর্ষায় কে স্নান করে?

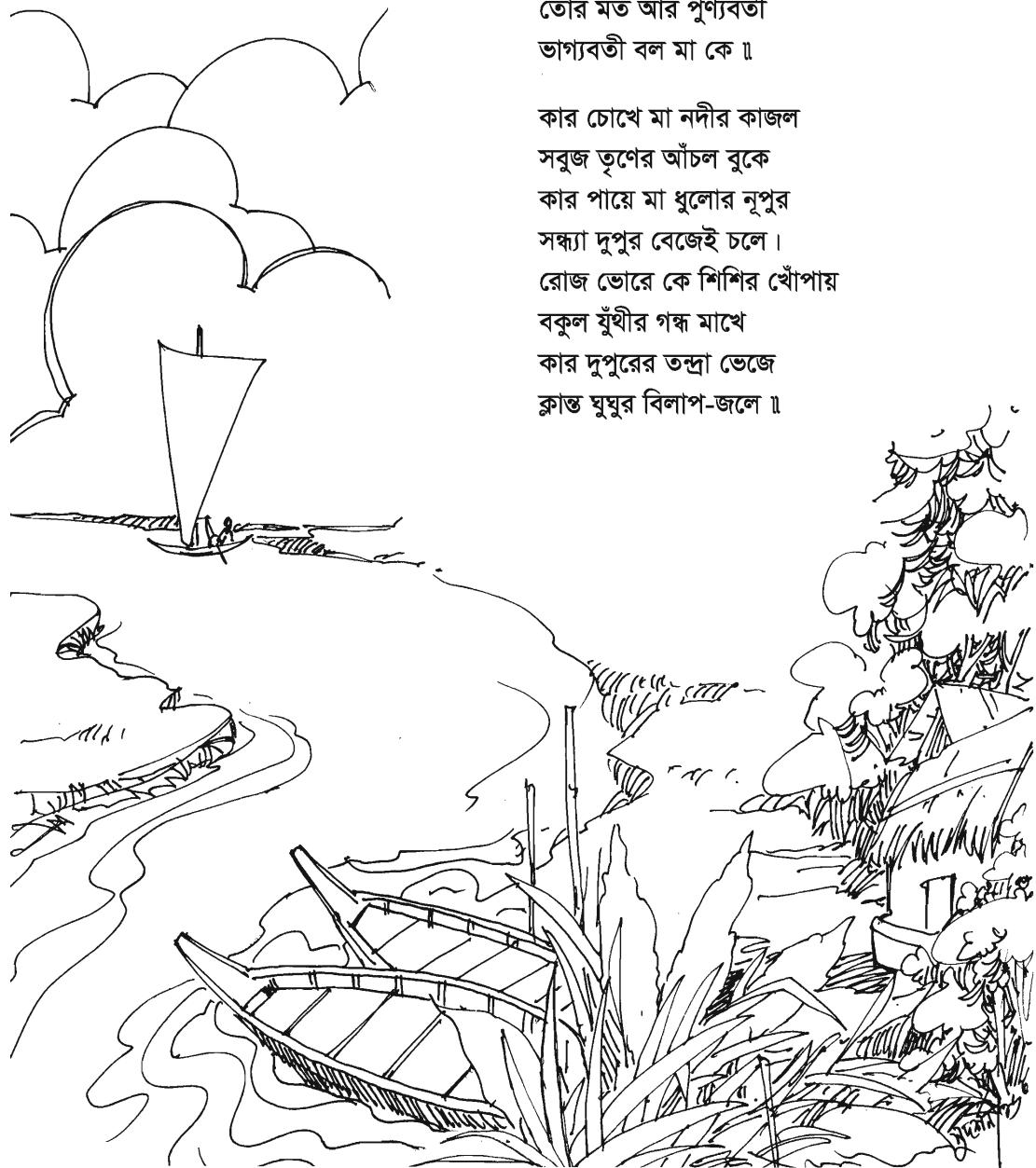
খ. ‘উম্মাদ শ্রাবণ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. ১ম উদ্দীপকে ‘শ্রাবণে’ কবিতায় বর্ণিত বর্ষার কোন দিকটি চিহ্নিত হয়েছে? বর্ণনা কর।

ঘ. ২য় উদ্দীপকটি ‘শ্রাবণে’ কবিতার শেষ চরণে প্রতিফলিত হয়েছে কি?— যুক্তিসহ বিচার কর।

গরবিনী মা-জননী

সিকান্দার আরু জাফর



ওরে আমার মা-জননী

জননীভূমি বাঞ্ছলারে

তোর মত আর পুণ্যবতী

ভাগ্যবতী বল মা কে ॥

কার চোখে মা নদীর কাজল

সবুজ তৃণের আঁচল বুকে

কার পায়ে মা ধুলোর নূপুর

সন্ধ্যা দুপুর বেজেই চলে ।

রোজ ভোরে কে শিশির খোপায়

বকুল ঝঁঠীর গন্ধ মাথে

কার দুপুরের তন্দ্রা ভেজে

ক্লান্ত ঘূঘুর বিলাপ-জলে ॥

কামার কুচোর কেলে জৰি
 বাঁচি সাতি শঙ্খ-জলালী,
 কাম হেলো নিষ্ঠ হাজার
 শান্ত-শান্তির সত্য পোদে,
 হেলো কুকুর খুন হোপাসো
 কেন্দ্ৰ কলনীৰ ওঁজল-কোলৈ
 সূর্যনিলী কাম কেজোৱা
 কামাকুচোর মকশা ঘোস ।

নেই যাকে কাম হাজার হাজার
 শা-শান্ত-শান্তি পালন কেল
 আজোৱ মাদে বীণিয়ে গুড়
 কুকুচোর সূর্যনিলকে ।
 কাম হেলো যা উপচৰ কালো
 শুলেট বীণিয়ে শান্ত-শান্তি
 সূর্যের খুনে সূর্য পুরিয়ে
 কাম হেলো সূর্য উপচৰ কালো ।

কুই তো দে-শা
 ও যা কুই তো যে নেই পৰিণী
 রক্ত-কেজো সজোভিনী
 শুণ-গৃহুয়ার তিছুলু
 পিতৃচূড়ি বাজলাত্তে ।

(পদবিশী)



শব্দার্থ ও টীকা

- পুণ্যবতী — পুণ্য বা ভালো কাজ করেন এমন নারী।
- সরোজিনী — সরোজ মানে পদ্ম – সরোজের স্তুবাচক রূপ সরোজিনী। এ কবিতায় দেশমাতৃকা বাংলাকে তুলনা করা হয়েছে কমনীয় পদ্মের সঙ্গে।
- ‘মরণ-মারের দণ্ড’ — মরণের আঘাত থেকে প্রাপ্তি শান্তি।
- ছোপানো — ছোপ মানে ছাপ, রঙ। এখানে ছোপানো মানে রাঙানো।
- পাগল ছেলে — বাংলার মুক্তিকামী বিদ্রোহী ও তরুণ-যুবকেরাই ‘পাগল ছেলে’ – যারা নির্ভয়ে যুদ্ধে-সংগ্রামে লিঙ্গ হয়েছিল।
- ‘ভয়করের দুর্বিপাকে’ — ভীতিকর দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা। এখানে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে বোঝানো হয়েছে।
- শাসন-কারা — পাকিস্তানি দুঃশাসন – যা ছিল কারাগারের সমান।
- উজল — উজ্জ্বল শব্দটির কোমল রূপ।
- ‘যুগ-চেতনার চিত্তভূমি
/ নিত্যভূমি বাঞ্ছারে’ — যুগের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করা চিরস্তন দেশমাতৃকা বাংলাদেশ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বদেশ চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি ‘বাঙ্গলা ছাড়ো’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। উপর্যুক্ত কবিতাটিতে পুণ্যবতী ভাগ্যবতী দেশমাতার গর্বিত হয়ে ওঠার কারণ অন্বেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে পরিবেশ-প্রকৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শ্রমজীবী, কৃষিজীবী থেকে শুরু করে সব পেশাজীবী সন্তান এই মায়ের কোল জুড়ে থাকে। এই মাকে রক্ষা করার জন্য এই সন্তানরা শত কষ্ট সহ্য করে, তবে কোনো অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারকে তাঁরা মেনে নিতে পারে না। মাকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে তাঁরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতেও দ্বিধা করে না। আবার এই মাকেও সন্তানের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখতে হয়। সন্তানকে সাহস ও শক্তি যোগাতে হয়। দেশমাতৃকাকে সকল দুঃশাসন থেকে রক্ষার জন্য মায়ের সন্তানরা ঝাপিয়ে পড়ে। তাঁরা যে কোনো দুঃসময়ে জেল জুলুম ফাঁসির দণ্ড মাথায় নিয়ে নিজের সুখ শান্তি ও আলস্য পরিহার করে দেশের জন্য আত্মাযাগ করতে দ্বিধা করে না। যুগের দাবি ও সময়ের দাবি রক্ষায় যে সন্তানরা সাহসের সাথে সংগ্রামের পথ বেছে নেয়, তাঁদের জন্য বাংলাদেশ সত্যিই গর্বিত। প্রকৃতপক্ষে বাংলার মাটি এই সাহসী ও সংগ্রামী জনতার ভিত্তিভূমি।

কবি-পরিচিতি

সিকান্দার আবু জাফর বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার ও সাংবাদিক। জন্মেছেন সাতক্ষীরা জেলায়। জন্মসাল ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ। পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ‘প্রসন্ন প্রহর’, ‘তিমিরাস্তিক’, ‘বাঙ্গলা ছাড়ো’ প্রত্তি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ তাঁর বিখ্যাত নাটক। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭৫ সালে।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. দেশপ্রেমমূলক কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর। (দলগত কাজ)
- খ. পূর্ববর্তী কোনো শ্রেণিতে পড়া তোমার ভালোলাগা কোনো স্বদেশপ্রেমের কবিতা সম্বক্ষে তোমার অনুভূতি লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বহনিবাচনি প্রশ্ন

১. মায়ের আঁচল কোণে কী লেগে আছে?
 - ক. বকুল ঝুঁঠীর গন্ধ
 - খ. কানা ফুলের নকশা
 - গ. ছেলের বুকের খুন
 - ঘ. সবুজ তৃণ
২. ‘গরবিনী মা-জননী’ কবিতায় ‘দুর্ভাগিনী মেয়ে’ বলে কাদের বোঝানো হয়েছে?
 - ক. বাংলার অবহেলিত মেয়েদের
 - খ. বাংলার গ্রামীণ মেয়েদের
 - গ. দুর্ভাগ্য জর্জরিত মেয়েদের
 - ঘ. যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মেয়েদের
৩. আমরা অপমান সইব না
 ভীরুর মত ঘরের কোণে রইব না
 আমরা আকাশ থেকে বজ্জ হয়ে ঝরতে জানি
 তোমার ভয় নেই মা
 আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।

উদ্দীপকের চেতনা নিচের যে চরণে বিদ্যমান —

- ক. কার ছেলেরা নিত্য হাজার
 মরণ-মারের দণ্ড গোনে
- খ. ছেলের বুকের খুন ছোপানো
 কোন জননীর আঁচল কোণে
- গ. মায়ের নামে ঝাঁপিয়ে পড়ে
 ভয়ঙ্করের দুর্বিপাকে
- ঘ. দুখের ধূপে সুখ পুড়িয়ে
 কার ছেলে মুখ উজল রাখে

৪। এক সাগর রঙের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনল যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।

— উদ্দীপকে ‘গরবিনী মা জননী’ কবিতায় উল্লিখিত বাঙালি সন্তানের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে?

- | | | | |
|----|------------|----|-------------|
| ক. | সংগ্রামের | খ. | গর্বের |
| গ. | প্রতিবাদের | ঘ. | আত্মত্যাগের |

সৃজনশীল প্রশ্ন

মা দিবসে রত্নগর্ভা স্বীকৃত মায়েদের পুরক্ষার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাহেদা বেগমের বড় ছেলে সাজিদ অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন — আমাদের মা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা। আমরা পিঠাপিঠি পাঁচ ভাই-বোন যখন খুব ছোট, তখনই বাবাকে হারালাম। মাকে কখনো ভেঙে পড়তে দেখিনি। দুঃখ-দারিদ্র্য-অভাব আমাদের নিত্য সঙ্গী ছিল। মা সব সময় আমাদেরকে খুশি রেখে, পড়াশুনা শিখিয়ে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তোমাকে শত সালাম ‘মা’। তোমার মুখের হাসির জন্য আমরা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

ক. সন্ধ্যা দুপুর মার পায়ে কী বাজে?

খ. ‘রঞ্জে ধোওয়া সরোজিনী’ — বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

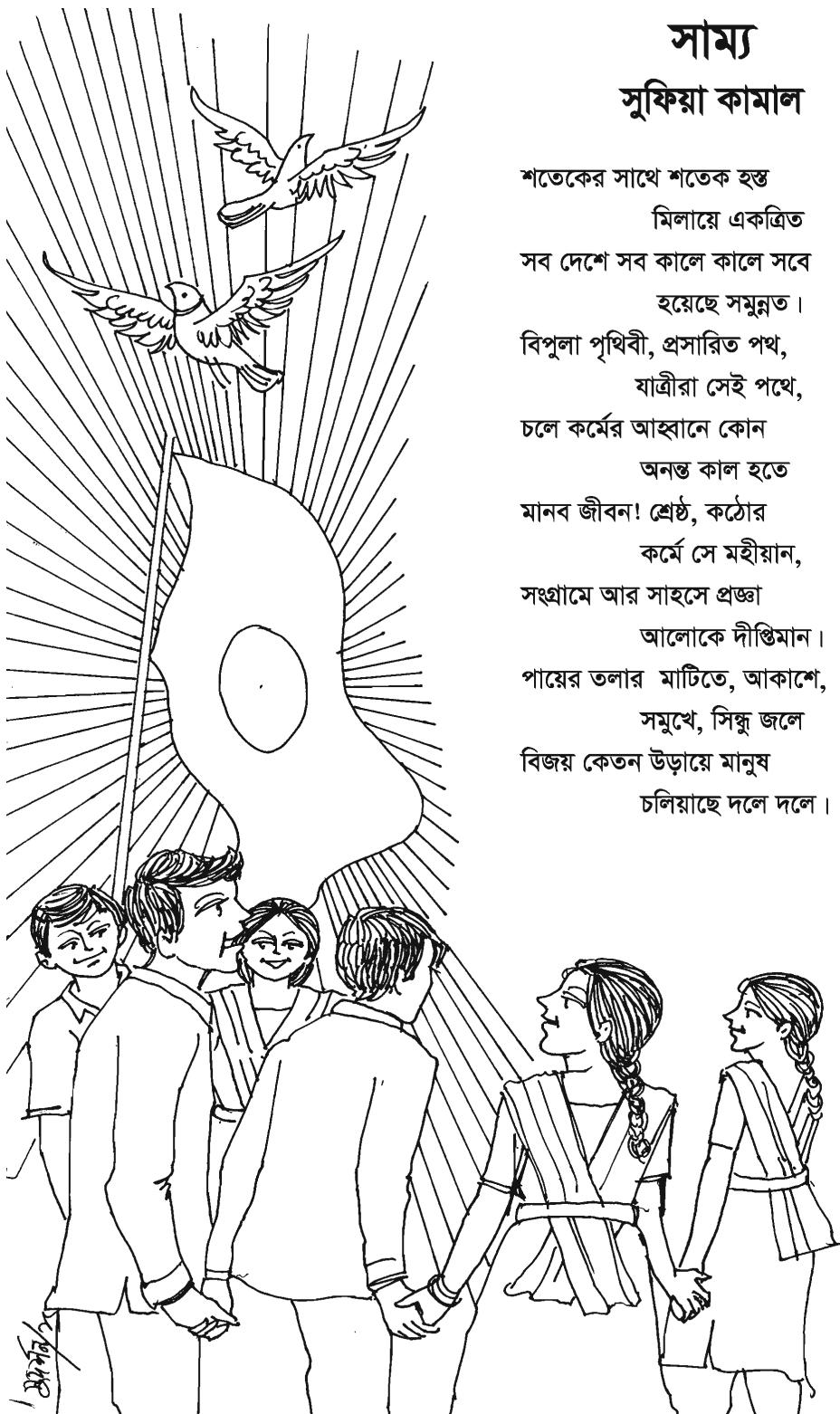
গ. সাজিদের মাধ্যমে ‘গরবিনী মা-জননী’ কবিতার কোন বিশেষ দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও ‘গরবিনী মা-জননী’ কবিতার বক্তব্য একই ধারায় প্রবাহিত” — বিশ্লেষণ কর।

সাম্য সুফিয়া কামাল

শতকের সাথে শতক হস্ত
মিলায়ে একত্রিত
সব দেশে সব কালে কালে সবে
হয়েছে সমুন্নত ।
বিপুলা পৃথিবী, প্রসারিত পথ,
যাত্রীরা সেই পথে,
চলে কর্মের আহ্বানে কোন
অনন্ত কাল হতে
মানব জীবন! শ্রেষ্ঠ, কঠোর
কর্মে সে মহীয়ান,
সংগ্রামে আর সাহসে প্রজ্ঞা
আলোকে দীপ্তিমান ।
পায়ের তলার মাটিতে, আকাশে,
সমুখে, সিঙ্গু জলে
বিজয় কেতন উড়ায়ে মানুষ
চলিয়াছে দলে দলে ।

(সংক্ষেপিত)



শব্দার্থ ও টীকা

শতেক	— একশত ।
সমুন্নত	— অতিশয় উঁচু ।
বিপুল	— বিশাল ।
প্রসারিত	— বিস্তার লাভ করেছে এমন ।
অন্ত	— যার অন্ত বা শেষ নেই ।
মহীয়ান	— সুমহান ।
সংগ্রাম	— লড়াই ।
প্রজ্ঞা	— গভীর জ্ঞান ।
দীপ্তিমান	— উজ্জ্বল ।
সিঙ্গু	— সমুদ্র, সাগর ।
কেতন	— পতাকা ।

পাঠের উদ্দেশ্য

ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার বোধ সৃষ্টি করা ।

পাঠ-পরিচিতি

‘সাম্য’ কবিতাটি ‘নওল কিশোরের দরবারে’ গ্রন্থভূক্ত ‘মিলিত সেবা ও সাম্য প্রীতিতে’ কবিতার অংশবিশেষ । কোনো বড় কাজ কেউ একা করতে পারে না । সে জন্য দরকার হয় অনেক মানুষের মিলিত অংশগ্রহণ । সকলকে নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে পৃথিবীর বহু দেশ উন্নত হয়েছে । পৃথিবীর অনেক মহৎ কাজের পেছনেই ছিল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা । অসীম সাহস, সম্মিলিত সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ এই পৃথিবীতে তার বিজয় ঘোষণা করেছে । এ জন্য ধর্ম, বর্ণ, গোত্র - শ্রেণি ভেদে সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে ।

কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ছিলেন একজন সফল সংগঠক ও নারীনেত্রী । তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সকল আন্দোলন-সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্ব�ৃদ্ধ করেছেন । স্বাধীন বাংলাদেশে নারীজাগরণ বিশেষ করে নারীদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন । সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপক্ষে তিনি সব সময় সোচার ছিলেন । তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ — ‘সাঁবোর মায়া’, ‘মায়া কাজল’, ‘কেয়ার কঁটা’ । তিনি ১৯৯৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন ।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন কর । (দলীয় কাজ)
- খ. সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে - তার পরিকল্পনা প্রস্তুত কর । (একক কাজ)

নমুনা প্রশ্ন

বহুবিকল্পিক প্রশ্ন

১. কর্মের আহানে মানুষ কত দিন হতে চলছে ?

ক. সহস্রাব্দকাল	খ. অনন্তকাল
গ. শতাব্দীকাল	ঘ. ঐতিহাসিক কাল

২. কালে কালে মানুষ কীভাবে সমৃদ্ধি হয়েছে ?

ক. সম্মিলিত প্রয়াসে	খ. একক প্রয়াসে
গ. সভ্যতার বিকাশে	ঘ. অর্থনৈতিক বিকাশে

উদ্ধৃতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (১) একতাই বল
- (২) চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা

৩. উদ্ধৃতির ১ম অংশের সাথে ‘সাম্য’ কবিতার কোন চরণসমূহের মিল আছে ?

i. বিপুলা পৃথিবী, প্রসারিত পথ / যাত্রীরা সেই পথে	খ. i ও iii
ii. শতকের সাথে শতকের হস্ত / মিলায়ে একত্রিত	
iii. বিজয় কেতন উড়ায়ে মানুষ / চলিয়াছে দলে দলে	

কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |
৪. উদ্ধৃতাংশের সাথে ‘সাম্য’ কবিতার কোন ভাবের মিল আছে ?

ক. সংগ্রাম	খ. প্রচেষ্টা
গ. সম্মিলিত অবস্থান	ঘ. সাহস

সূজনশীল প্রশ্ন

১. অমিত সাহেব একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তাঁর একার পক্ষে এত বিশাল কাজ সম্পাদন কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। তিনি কারও সহযোগিতা নিতে সম্মত নন। পরে গ্রামের সকল শ্রেণির মানুষের সার্বিক সহযোগিতায় পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এখন সবাই পাঠাগার থেকে বই সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে পারছে।

ক. ‘সাম্য’ কবিতায় কোনটির মাধ্যমে জীবন মহীয়ান হয়?	খ. ‘সংগ্রামে আর সাহসে প্রজ্ঞ’ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
গ. অমিত সাহেবের চরিত্রে ‘সাম্য’ কবিতার বৈসাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা কর।	ঘ. “উদ্দীপকের মূলভাব যেন ‘সাম্য’ কবিতারই প্রতিরূপ” — বিশ্লেষণ কর।

মেলা

আহসান হাবীব

ফুলের মেলা পাখির মেলা
 আকাশ ঝুঁড়ে তারার মেলা
 গ্রোগ সকালে বাজের মেলা
 সাত সাগরে চেউজের মেলা।
 আর এক মেলা জগৎ ঝুঁড়ে
 ভাইরা মিলে বোনো মিলে
 বৎ কৃত্তিয়ে বেঢ়ার ভারা
 নীল আকাশের অপার নীলে
 ফুলের বুকে সুবাস বতো
 বুকে - ঘূর্খে দের দেখে তাই
 পাখির কলকণ্ঠ থেকে
 সূর ফুলে নেয় তারা সবাই।
 বাতের পথে পাড়ি বখন,
 তারার অবাক দীপ ঝেলে নের।
 গ্রোগ সকালের আকাশগতে
 আলোর পাখি দের ছেড়ে দেয়
 সাত সাগরের বুক থেকে নেয়
 চেউ ফুলে নেয় ভালোবাসার।
 জগৎ ঝুঁড়ে বায় ছড়িয়ে,
 বায় ছড়িয়ে আলো আশার।
 ভালোবাসার এই বে মেলা
 এই বে মেলা ভাই-এর বোনের,
 এই বে হাসি এই বে খুশি
 এই বে শ্রীতি লক্ষ মনের -
 কচি সবুজ ভাই-বোনদের
 আপনি পঞ্চা এই বে মেলা,
 এই মেলাতে নিত্য চলে
 আগন মনে একটি খেলা।
 সারা বেলাই সেই এক খেলা
 গঢ়বে নতুন একটি বাণান,
 অনেক ফুল আৰ অনেক পাখি
 সুব পাখিদের আলাদা গান -
 তাৰ মাঝেই একটি সুরে
 সবাই সুব বায় খিলিয়ে
 এক দুনিয়া এক যানুবের
 বপ্প তারা যাব খিলিয়ে।



শব্দার্থ ও টীকা

- মেলা - মিলন বা একত্র হওয়া। উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনেক মানুষের সমাবেশ। যেমন বৈশাখি মেলা; এরকম বই মেলা, কৃষি মেলা, বিজ্ঞান মেলা ইত্যাদি।
- ‘আর এক মেলা’
- ‘জগৎজুড়ে’ - পৃথিবীর সকল শিশু-কিশোরের মিলনের বা একতার উৎসবকে কবি অন্য এক রকমের মেলা বলেছেন।
- সুবাস - সুগন্ধ।
- নিত্য - রোজ।
- ‘তার মাঝেই
- একটি সুরে
- বিলিয়ে’ - ভৌগোলিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে মানুষেরা আলাদা আলাদা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও মনুষ্যত্বের দিক থেকে সকল মানুষ এক। সেই এক মিলনের সুরে সবারই সুর মিশে যায়।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী-পুরুষের সমতার চেতনা জাগ্রত করা।

পাঠ-পরিচিতি

পৃথিবীর চারদিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই তবে দেখতে পাই বাগানে ফুলের মেলা, গাছে গাছে পাথির মেলা আর আকাশে তারার মেলা। এ হলো প্রকৃতির জগৎ। অন্যদিকে পৃথিবীর শিশু-কিশোরদের রয়েছে একটা আলাদা জগৎ। আর এটিও একটি মেলার মতো। আকাশের নীলের মধ্যে যে উদারতা রয়েছে, ফুলের মধ্যে যে পবিত্র সুবাস রয়েছে, পাথির গানের মধ্যে যে সুর রয়েছে সবই পেয়েছে শিশু-কিশোররা। প্রতিদিন আকাশ নিংড়ে যে রোদ ওঠে, সেখান থেকে তারা নেয় জীবনের উত্তাপ, সাত-সাগরের বুক থেকে তারা নেয় ভালোবাসার চেট। তাই তারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে দেয় নবীন প্রাণের আশার আলো। কচি সবুজ ভাইবোনদের হাসি-খুশির মধ্যে লক্ষ লক্ষ সবুজ মনের মেহ-প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে, দেশ-কালের সীমানা ভেঙে তারা অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে গড়তে চাচ্ছে একটি সুন্দর জগৎ, সাজানো বাগানের মতো সুন্দর পৃথিবী। এ পৃথিবী হবে সকল মানুষের জন্য একটা অভিন্ন পৃথিবী। পৃথিবীর সকল শিশু-কিশোরের ভাষা এক নয়। তবুও সব পাথির গানের মধ্যে যেমন একটা সুরের ঐক্য আছে, তেমনি পৃথিবীর শিশু-কিশোরদের মনের ভাষার মধ্যেও একটা মিল আছে। পৃথিবীর সব মানুষ একতাবন্ধ হয়ে মেহ-ভালোবাসা পূর্ণ একটা সমাজ যদি গড়ে তোলে, তবে এ পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো বিবাদ থাকবে না। তখন পৃথিবী হবে একটা দেশ, মানবসমাজ হবে একটা পরিবার। তখন কত সুন্দর হবে এ পৃথিবী।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি আহসান হাবীব। তিনি ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে : ‘রাত্রিশে’, ‘ছায়াহরিণ’, ‘সারাদুপুর’, ‘আশায় বসতি’ ইত্যাদি। তাঁর লেখা শিশুতোষ গ্রন্থগুলো বেশ জনপ্রিয়। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কবি আহসান হাবীব ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. কবিতাটি নিয়ে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।
- খ. কবিতাটিতে ব্যবহৃত প্রকৃতিকেন্দ্রিক শব্দগুচ্ছের একটি তালিকা তৈরি কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রাতের পথে পাড়ি দিতে শিশু কিশোররা কীসের আলো জ্বলে নেয়?

- | | |
|-------------|------------|
| ক. চাঁদের | খ. তারার |
| গ. প্রদীপের | ঘ. জোনাকির |

২. ‘আরেক মেলা জগৎ জুড়ে’ - বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- i মিলনের মেলা
- ii. একতার মেলা
- iii. রঙের মেলা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. সুন্দর সকাল। ফুলের সুবাস! রঙবেরঙের প্রজাপতি নবনীকে মুক্ত করে।

- উদ্দীপকে ‘মেলা’ কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে -

- | |
|---------------------|
| ক. প্রকৃতির জগৎ |
| খ. আরেকটা মেলা |
| গ. আশার আলো |
| ঘ. অন্তরের ভালোবাসা |

৪. কিশোর মোরা উষার আলো আমরা হাওয়া দুরস্ত
মনটি চির বাঁধন হারা পাখির মত উড়স্ত –

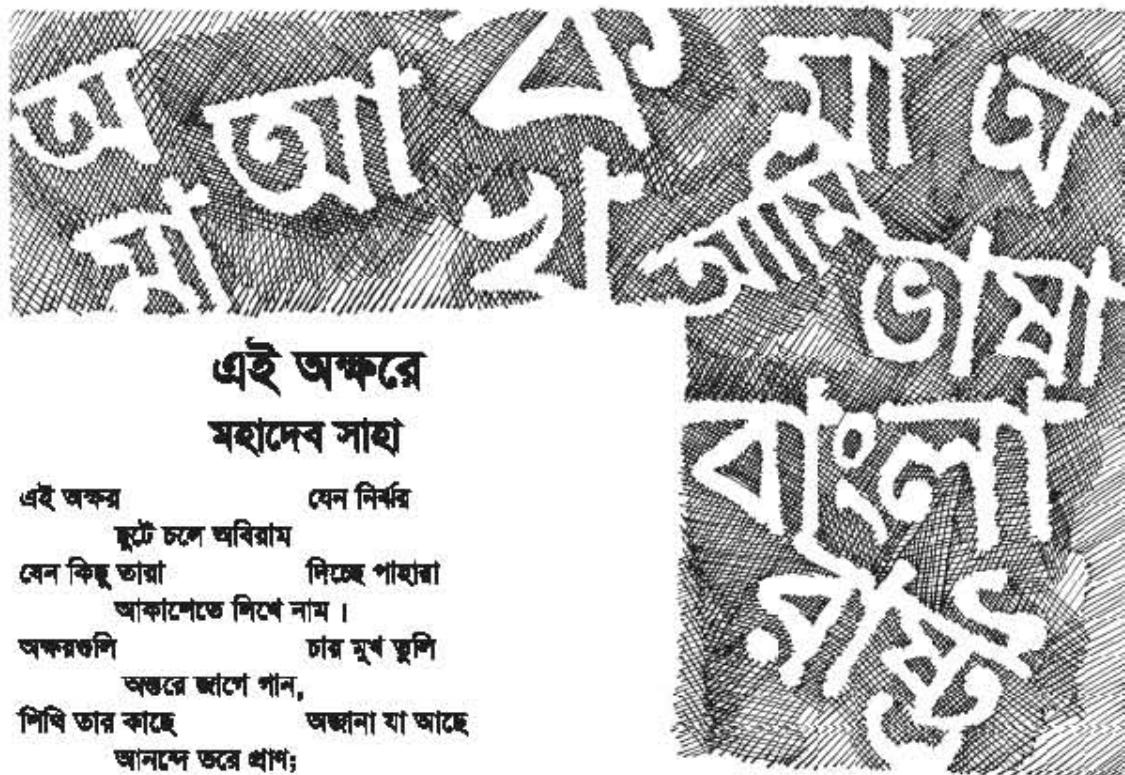
এখানে কিশোরদের ‘উষার আলোর’ সঙ্গে তুলনা করার দিকটি মেলা কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ,
কারণ শিশু কিশোরদের –

- ক. পাখির গানের সুর আছে
- খ. অন্যরকম জগৎ রয়েছে
- গ. মনের ভাষা এক ও অভিন্ন
- ঘ. আশা ছড়াবার প্রাণশক্তি আছে

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১। স্বাধীনতা ও জাতীয়দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে বাংলা শিক্ষক বললেন, ‘৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের
পর আমরা পেয়েছি এই মুক্ত আকাশ-বাতাস, পেয়েছি ছায়া সুনিবিড়-শান্তির নীড়, এই বাংলাদেশ।
প্রধান শিক্ষক বললেন, ‘তোমরা আজকের শিশু-কিশোররা আগামী দিনের স্বপ্ন। শুধু দেশ ও জাতির
জন্য নয়, শিশুরা সারা বিশ্বের সম্মতিনা।’

- ক. নীল আকাশে রং কুড়িয়ে বেড়ায় কারা?
- খ. কবি আহসান হাবীব ‘আলোর পাখি’ বলতে কী বুঝিয়েছেন?
- গ. বাংলা শিক্ষকের বক্তব্যে ‘মেলা’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “প্রধান শিক্ষকের মতব্যে ‘মেলা’ কবিতার মূল বক্তব্যই ফুটে উঠেছে” – বিশ্লেষণ কর।



ଏହି ଅକ୍ଷରେ

ମହାଦେବ ସାହା

ଏହି ଅକ୍ଷର

ଛୁଟେ ଚଲେ ଅବିରାମ

ମେନ କିଛୁ ଭାବା

ଆକାଶେତେ ଲିଖେ ନାମ ।

ଅକ୍ଷରତଳି

ଅନ୍ତରେ ଛାଲେ ଗାନ,

ଶିଥି ଭାବ କାହେ

ଆନନ୍ଦେ ଭରେ ଥାପ;

ମେନ ନିର୍ବିର

ନିଜେ ପାହାରା

ଚାର ମୂର୍ଖ ତୁଳି

ଅଜାନୀ ଯା ଆହେ

ଆନନ୍ଦେ ଭରେ ଥାପ;

ଏହି ଅକ୍ଷରେ

ମନ ହରେ ଯାଇ ମନୀ,

ଆର କିଛୁ ଭାଇ

ଚିଠିଖାନା ପାଇ ସଦି ।

ସେଇ ଉପମାର

ଦେବି ଅପରାଧ ହବି —

ମନକାଳ ଦୁଃଖ

ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ

ବାଜାଯ୍ ଉଦ୍‌ବାସ କବି ।

ଯାକେ ମନେ ପଡ଼େ

ପାଇ ବା ନା ପାଇ

ମନ ଭରେ ଯାଇ

ମନ ଭରେ ଯାଇ

ଏହି ଅକ୍ଷରେ

ଡାକ ନାମ ଥରେ

ଡାକ ଦେଇ ବୁଝି କେଟେ,

କଥେର ଯତୋ

ଝାପକଥା ଯତୋ

ଅନ୍ତରେ କୋଲେ ଚେଟେ ।

ଏହି ଅକ୍ଷର

ଆଜ୍ଞାୟ-ପର

କାଳେରେ କାହେ ଟାଲେ,

ଏହି ପ୍ରିସ ଭାବା

ବୁକେ ଦେଇ ଆଶା

ବିଦୋହିତ କରେ ଗାଲେ ।

ଏହି ଅକ୍ଷରେ

କଠିନ ପାଥରେ

ଶିଳାଲିପି ଲେଖା ହୁଏ,

শব্দার্থ ও টীকা

- অক্ষর - অক্ষর বলতে এখানে বর্ণ এবং বৃহৎ অর্থে মাতৃভাষা বোঝানো হয়েছে।
- নির্বার - ঝরনা।
- ‘এই অক্ষর যেন নির্বার ছুটে চলে অবিরাম’ - আমরা আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলি, লিখি। আমাদের পূর্বপুরুষেরাও তা-ই করতেন। তাই বলা হয়েছে মাতৃভাষা অবিরাম ছুটে চলেছে। মানে মাতৃভাষার মাধ্যমে আমরা নানা কাজ করে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি।
- ‘যেন কিছু তারা দিচ্ছে পাহারা আকাশেতে লিখে নাম’ - এক সময়ে আমাদের এই দেশ পরাধীন ছিল। শাসকেরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করার সুযোগ থেকে আমাদের বিপ্রিত করেছিল। কিন্তু তখনকার সচেতন বাঙালিরা এ অধিকার আদায় করে নেয়। সে অধিকার আদায় করার জন্য অক্ষরগুলো যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুপ্রেরণার বিষয় হয়ে আছে।
- ‘এই অক্ষরে মাকে মনে পড়ে’ - মায়ের কাছ থেকেই আমরা মাতৃভাষা প্রথম শিখি। তাই অক্ষর বা ভাষার দৃষ্টান্ত দেখলেই মাকে মনে পড়ে যায়।
- উপমা - তুলনা।
- অপরাপ - খুব সুন্দর।
- নৃপুর - পায়ে পড়ার অলংকার।
- রূপকথা - রাজা-বাদশা, রাজপুত্র-রাজকন্যা, দৈত্য-দানো, রাক্ষস-খোক্ষস প্রভৃতি কাহিনি নিয়ে কাল্পনিক গল্পকে বলে রূপকথা।
- শিলালিপি - পাথরে খোদাই করা লেখা, অনেক দিন স্থায়ী করে রাখার জন্য লেখা পাথরে বা তামার পাতে লিখে রাখা হতো। এরকম পাথরের ওপর লেখাকে বা ঐ পাথরের খণ্ডিকে বলা হয় শিলালিপি।
- ‘এই ভাষা দিয়ে গান লিখে নিয়ে যুদ্ধ করেছি জয়’ - এ কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মাতৃভাষার মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের উদ্ব�ৃদ্ধ করা হয়েছে। তাই কবি বলেছেন যে এই ভাষা দিয়ে আমরা লিখেছি মুক্তির গান। আর সেই গান মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ জুগিয়েছে। সুতরাং মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন থেকে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা।

পাঠের উদ্দেশ্য

মাতৃভাষার প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ জাগুত করা।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলা অক্ষর বা বর্ণ বাঙালি জাতির অনন্য সম্পদ। এই বর্ণমালা বাঙালির প্রাণের সঙ্গে অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। বাংলা অক্ষর বাঙালির চিন্তকে আনন্দে ভরে দেয়। বাঙালিকে করে তোলে স্বপ্নমুখী। বাংলা অক্ষর বাঙালির চোখে দেখা দেয় মায়ের রূপ ধরে। কখনো তার চিন্তে বাজায় সুরের নৃপুর।

বাংলা অক্ষর বাঙালির মিলিত সত্ত্বার শ্রেষ্ঠতম উৎস। আমাদের অক্ষরসমূহ আপন-পর সকলকে কাছে টানে, দূর করে দেয় সব বিভেদে। বাংলা অক্ষর বাঙালির বুকে সঞ্চার করে অবারিত আশা। আলোচ্য কবিতাটিতে ৯
বাংলা অক্ষর তথা বর্ণমালার প্রতি কবির অবারিত ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কবি মহাদেব সাহা। তিনি ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। মহাদেব সাহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: ‘এই গৃহ এই সন্ধ্যাস’, ‘অসমিত কালের গৌরব’, ‘টাপুর টুপুর মেঘের দুপুর’, ‘ছবি আঁকা পাথির পাখা’, ‘সরমে ফুলের নদী’ ইত্যাদি।

কর্ম-অনুশীলন

- তোমার পূর্বে পড়া বাংলা ভাষা বিষয়ক একটি গল্প বা কবিতা অবলম্বনে একটি রচনা তৈরি কর (একক কাজ)।
- ভাষা-আন্দোলন নিয়ে রচিত কবিতাসমূহ সংগ্রহ করে একটি দেয়ালিকা প্রকাশ কর (দলীয় কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- এই অঙ্করে কবিতায় কাকে মনে পড়ার কথা বলা হয়েছে ?
 - প্রিয়জনকে
 - মাকে
 - দেশকে
 - ভাষাকে
- ‘এই অঙ্কর যেন নির্বর / ছুটে চলে অবিরাম’ - চরণদয় দ্বারা কবি বুঝিয়েছেন -
 - মাতৃভাষায় আমরা অতীত ইতিহাস জানি
 - বর্তমানকে আমরা মাতৃভাষায় বুঝতে পারি
 - আমরা ভবিষ্যতের স্পন্দন বুনি মাতৃভাষায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i | খ. | ii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (১) বাংলার গল্প বাংলার গীত
শুনিলে এ চিত্ত সদা বিমোহিত
- (২) সুখে দুঃখে তারা এসে মোর পাশে
তোমে সদা মোরে মধুর সন্তানে
৩. ১ নং পঙ্কজিদুয়ে ‘এই অঙ্কর’ কবিতার কোন দিকটির প্রকাশ পেয়েছে ?
 - ভাষাপ্রীতি
 - প্রকৃতিপ্রীতি
 - মর্ত্যপ্রীতি
 - স্বদেশপ্রীতি

৪. ২ নং পঙ্কজিদয়ের বক্তব্যে নিচের কোন চরণ/চরণসমূহে প্রকাশ পেয়েছে ?
- এই অক্ষরে / ডাকনাম ধরে / ডাক দেয় বুবি কেউ
 - এই অক্ষর / আতীয়-পর / সকলেরে কাছে টানে
 - এই অক্ষরে / মাকে মনে পড়ে / মনে হয়ে যায় নদী

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. আর তাই তো কখনো আমি পড়তে দিই নি ধূলো, এই কালো
এ-কারে আ-কারে

তারা যেন ক্ষেতের সোনালি পাকা ধান, থোকা থোকা
পড়ে থাকা জুই।
তোমার জন্য জয় করেছি একটি যুদ্ধ
একটি দেশের স্বাধীনতা।

- ক. কঠিন পাথরে কী লেখা হয়?
- খ. ‘এই অক্ষরে – মাকে মনে পড়ে’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? – ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকের ‘তারা’–‘এই অক্ষর’ কবিতার কিসের সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকের শেষ দুটি চরণে ‘এই অক্ষর’ কবিতার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবার্থ ফুটে উঠেছে।
– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

সমাপ্ত



দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অহংকার পতনের মূল

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করছন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য